কাকোরী-ষড়যন্ত্র

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

বমণ পাবলিশিং হাউস
৭২ হ্যারিসন রোড :: কলিকাতা

প্রকাশক
ব্রজবিহারী বর্মণ
বর্মণ পাবলিশিং হাউস
৭২ হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা

প্রকাশ কাল—শ্রাবণ ১৩৩৯

প্রিণ্টার
শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্তী
নিউ মডার্ণ আর্ট প্রিণ্টার্স
৮৫এ, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট
কলিকাতা

উৎসর্গ পত্র

দেশসেবাকেই যাহারা জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিবেন দেশের সেই সমস্ত তরুণ তরুণীদের উদ্দেশ্যে এই বীরচতুষ্টয়ের জীবনকাহিনী উৎসর্গ করিলাম।

মণীন্দ্র রায়

মা (গোকার) : বিমল সেন (৮ম সংস্করণ)
খনির গোলাম : এমিলি জোলা -- ঐ
গল্পের ছলে : (২য় সংস্করণ) ঐ
ডননদীর গতিপথে : শোলকোভ . স্বধীন সরকার (৩য় সংস্করণ)
সহধর্মিণী : ডি, কেটায়েভ : অশোক গুহ
আক্রমণ : লিওনিড লিওনোভ : অত্রি বসু
উদয়গড় : মনোরঞ্জন হাজরা
ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি : ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
১ম খণ্ড—বৈদিক যুগ ও তৎপরবর্তী যুগ
২য় খণ্ড—মৌর্য যুগ থেকে বর্তমান যুগ
৩য় খণ্ড—ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের ধারা
ভারতীয় একজাতীয়তা গঠন-সমস্যা
ভারতীয় দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম
যা অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস
১ম খণ্ড : ভারতে বিপ্লব প্রচেষ্টা
২য় খণ্ড : ভারতের বাহিরে বিপ্লব-প্রচেষ্টা
মণীন্দ্রনারায়ণ রায়
কাকোড়ীর ষড়যন্ত্র
* যন্ত্রস্থ
সাম্যবাদীর ফতোয়া : (মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স) ব্রজবিহারী বর্মণ
মজুরি ও পুঁজি (মার্ক্স) (২য় সংস্করণ)
কম্যুনিজম (২য় সংস্করণ) অমূল্য অধিকারী
শ্রেণী সংগ্রাম (") "
লেনিন ও বলশেভিক পার্টি (২য় সংস্করণ) রেবতী বর্মণ
মার্ক্সীয় ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি (") স্বদেশ দাস
সমাজের ক্রমবিকাশ : শান্তিপ্রিয় মুখার্জী
সোভিয়েট রিপাব্লিক : সৌম্যেন ঠাকুর

অনাগত সুদিনের তরে ঃ হেম কানুনগো

ভারতীয় রাজনীতি ও ডায়ালেকটিক ঃ শ্রীশ চক্রবর্তী

ক্ষুদিরাম (২য় সংস্করণ) [১৯০৩ সালে বাজেয়াপ্ত]

ফাঁসীর সত্যেন (”) [১৯৩০ সালে বাজেয়াপ্ত]

বিপ্লবী কানাইলাল

বিপ্লবী যতীন মুখার্জী

বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী

টাকার থলি বাহির করিয়া লইল ; তারপর সকলে মিলিয়া নিতান্ত সহজ ভাবেই চলিতে চলিতে অতি অল্প কালের মধ্যেই গাঢ় অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। যাত্রিগণের মধ্যে যখন চৈতন্য ফিরিয়া আসিল তখন যুবকদল লক্ষ্ণৌ সহরে প্রবেশ করিয়াছে।

পরদিন ইংরাজী, বাংলা, হিন্দি, উর্দু প্রভৃতি খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে এই ডাকাতির বিবরণ প্রকাশিত হইল। ষ্টেটসম্যান প্রভৃতি কাগজে ইহার টিপ্পনি বাহির হইল যে এরূপ ডাকাতি নিশ্চয়ই কোন রাজনৈতিক-ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত। সরকারও ঘটনার এই ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইলেন, গোয়েন্দা-বিভাগের বড় বড় কর্মচারী-দিগের উপর এই ব্যাপার অনুসন্ধান করিবার ভার অর্পণ করা হইল।

এক মাসেরও অধিককাল তদন্ত চলিল, তারপর আরম্ভ হইল ধর-পাকড়ের ধূম। ২৩শে সেপ্টেম্বর একই সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাসী হইল, তারপর প্রত্যহই পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ দলে দলে যুবকদের গ্রেপ্তার করিয়া আনিতে লাগিলেন। ধৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই কংগ্রেস-কর্মী ; ত্যাগ ও সেবাদ্বারা তাঁহারা জন-সাধারণের ভালবাসা ও সহানুভূতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহাদের গ্রেপ্তারে স্বভাবতঃই সমস্ত যুক্তপ্রদেশ জুড়িয়া এক দারুণ বিক্ষোভের সঞ্চার হইল। দেশীয় সংবাদপত্রে এই দমননীতির তীব্র সমালোচনা বাহির হইতে লাগিল, কিন্তু সরকার অচল অটল। সম্রাটের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র করিবার দায়ে যাঁহারা অভিযুক্ত, তাঁহাদিগকে দণ্ড প্রদান করিতে হইলে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলে চলিবে কেন ?

যাহা হউক, অভিনয় হইলেও আইনসঙ্গতভাবে বিচারের অভিনয় করিতে হইলে সাক্ষী-প্রমাণের আবশ্যক। সরকারের জবরদস্ত কর্মচারিগণ

ছলে বলে কৌশলে সাক্ষী-সাবুদ সংগ্রহ করিতে লাগিয়া গেলেন। লক্ষ্ণৌ জেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেখানে গুপ্তপুলিশের আনাগোনা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কত প্রলোভন, কত শাঠ্য, কত জাল-জুয়াচুরির আশ্রয় লইয়াই না এই সাক্ষী সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছিল! অভিযুক্তদিগকে পৃথক পৃথক কামরায় আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল, পুলিশ কর্মচারিগণ ছলে বলে সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য ইহাদের সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে দেখা করিতে আরম্ভ করিলেন। কাহাকেও ভয় দেখান হইল, আবার কাহারও নিকট গিয়া পুলিশ কর্মচারী চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, 'হায়রে দুর্ভাগা দেশ! আপনারই সহকর্মী আপনার বিরুদ্ধে সকল কথা আজ পুলিশের নিকট প্রকাশ করে দিয়েছে; উদ্দেশ্য, সহকর্মীর প্রতি সহকর্মীর বিদ্বেষ জন্মাইয়া গুপ্তকথা বাহির করিয়া লওয়া। আবার কাহাকেও বলা হইল, গুপ্ত খবর প্রকাশ করিয়া দিলে ২৫ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে; কাহাকেও বলা হইল, 'সমস্ত খবর ব'লে দাও, তোমাকে সরকারী খরচে বিলাতে লেখা-পড়া শেখবার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হবে।' অধিকাংশ অভিযুক্ত ব্যক্তিই সমস্ত প্রলোভন ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়া আপন আপন সঙ্কল্পে অটল হইয়া রহিলেন, কিন্তু জয়চাঁদ মিরজাফরের দেশে বিশ্বাসঘাতকের অভাব হইবে কেন? শাহ-জাহানপুরের বানারসীলাল কাকোশ এবং ইন্দুভূষণ মিত্র প্রাণের দায়েই হউক বা পুরস্কারের লোভেই হউক, সহকর্মীদিগের সর্বনাশ সাধনে করিতে প্রবৃত্ত হইল। লক্ষ্ণৌ জেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ একদিন সবিস্ময়ে শুনিতে পাইল যে, ইহারা সরকারী সাক্ষী হইতে স্বীকৃত হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ নরেন্দ্রনাথের হত্যার পর হইতে সরকারী সাক্ষী সম্বন্ধে সবিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে শিক্ষা করিয়াছিল, তাই মীরজাফরের জ্ঞাতিভাই এই দুই

বিশ্বাসঘাতককে অবিলম্বে লক্ষ্ণৌ জেল হইতে স্থানান্তরিত করা হইল। বনারসীলাল পুলিশের হেফাজতেই রহিল, ইন্দুভূষণকে স্বীয় পিতার তত্ত্বাবধানে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

কিন্তু এত পরিশ্রম করিয়াও সরকার ১৫ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির * বিরুদ্ধে কোনই প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া বিচার আরম্ভ হইবার পূর্বেই ইহাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করা হইল।

১৯২৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারী স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট আইনুদ্দিন সাহেবের এজলাসে বাকী ২৯ জন আসামীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী আরম্ভ হইল। ৬৫ দিন ধরিয়া শুনানী চলিল। ২৪৭ জন সরকারী সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হইল।

হাতে হাতকড়ি এবং পায়ে বেড়ি পড়িয়া ২৯ জন যুবক আসামী দিনের পর দিন তাহাদের বিরুদ্ধে স্তূপীকৃত অভিযোগ নিশ্চিন্ত কৌতূহলের সঙ্গে মনোযোগ সহকারে শুনিয়া যাইতে লাগিল। কাহারও মুখে বিষাদের রেখাটুকু পর্যন্ত অঙ্কিত হইল না। অধিকন্তু, স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট আপনার রায় প্রদান করিবার সময় যখন অন্য সকলকে দায়রায় সোপর্দ করিয়া জ্যোতিশঙ্কর দীক্ষিত এবং বীরভদ্র তেওয়ারীকে নির্দোষ বলিয়া মুক্তি প্রদান করিবার আজ্ঞা দিলেন তখন জ্যোতিশঙ্কর বড় দুঃখের সহিত বলিয়া উঠিয়াছিল "সে কি? আজই আমায়

---

* (১) শ্রীরামদত্ত শুক্ল (২) শ্রীশীতলা সহায় (৩) শ্রীচন্দ্রধর জহুরী, (৪) শ্রীমদন লাল (৫) শ্রীরামরত্ন শুক্ল (৬) শ্রীবাবুরাম বর্মা (৭) শ্রীগোপীমোহন (৮) শ্রীশরচ্চন্দ্র গুহ (৯) শ্রীমোহনলাল গৌতম (১০) শ্রীচন্দ্রমল জহুরী (১১) শ্রীহরনাম সুন্দরলাল (১২) মিঃ ডি ভিডট্টাচার্য (১৩) শ্রীভৈরী সিংহ (১৪) শ্রীকালিদাস বসু ও (১৫) শ্রীইন্দ্রবিক্রম সিংহ।

ছেড়ে দেবেন? আর দু-এক দিন থাকতে দেবেন না?" তাহার অনুরোধে কেহই কর্ণপাত করিল না, কাংগড়া হইতে এই দুই ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া দেওয়া হইল। কারা-যন্ত্রণায় যাহাদের মুখে উদ্বেগ বা বেদনার রেখাটুকু পর্যন্ত অঙ্কিত হয় নাই, আজ আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় তাহাদের মুখ মলিন হইয়া গেল। যাহাদিগকে জীবন-মরণের নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গী বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাদিগকে মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া রাখিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী স্বদেশ-প্রেমিক কি মুক্তির আনন্দ উপভোগ করিতে পারে?

যাহা হউক, যথাসময়ে মকদ্দমার দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইল। স্পেশ্যাল জজ হ্যামিলটন সাহেবের দায়রা আদালতে ২৭ জন রাজদ্রোহী যুবকের জীবন-মরণ সমস্যা লইয়া দিনের পর দিন ব্যঙ্গ চলিতে লাগিল। দৈনিক চারিশত মুদ্রা ফি লইয়া যুক্তপ্রদেশের সুবিখ্যাত আইনজীবী পণ্ডিত জগৎনারায়ণ সরকারপক্ষে মামলা চালাইতে লাগিলেন। আসামীগণ গরীব, ভারত সরকারের মত দরিদ্র ভারতবাসীর রক্ত শোষণ করা টাকা জলের মত ব্যয় করিবার ঈশ্বরদত্ত অধিকার তাহাদের নাই। তবে তাহারা স্বদেশ-সেবার অপরাধে অপরাধী, তাই দয়াপরবশ হইয়া কয়েক জন আইনজীবী নামমাত্র পারিশ্রমিকে ইহাদের পক্ষ সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কলিকাতা হইতে মিঃ চৌধুরী, লক্ষ্ণৌ হইতে শ্রীমোহনলাল সাক্সেনা, শ্রীচন্দ্রভাল গুপ্ত, শ্রীকৃপাশঙ্কর হাজরা প্রভৃতি কয়েকজন উকিল তাহাদের এই সদাশয়তার জন্য চিরকাল ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া থাকিবেন। গুরুতর ফৌজদারী মামলায় আসামীর পক্ষ সমর্থিত না হইলে বৃটিশ 'ন্যায় বিচারের' মর্যাদা রক্ষিত হয় না। আসামীর আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার সামর্থ্য না থাকিলে সরকার নিজের খরচে আইনজীবী নিযুক্ত করিয়া দেন। এক্ষেত্রেও বিচারের অভিনয়কে যথাসম্ভব স্বাভাবিকতার

আকার প্রদান করিবার জন্য সরকার পণ্ডিত হরকরণ নাথ মিশ্রকে অভিযুক্তের পক্ষে উকীল নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

প্রায় এক বৎসর ব্যাপিয়া এই মামলা চলিল এবং এই এক বৎসর কাল দোষী প্রতিপন্ন না হওয়া সত্ত্বেও আসামীদিগকে পূর্ণমাত্রায়ই কারা-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল। সে কি লাঞ্ছনা, সে কি অত্যাচার! সভ্য ইংরাজের কারাগারে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের অন্তরালে দোষী-নির্দোষ-নির্বিশেষে সরকারের রোষবহ্নিতে নিক্ষিপ্ত পতঙ্গকে প্রতিনিয়ত যে দুঃসহ উৎপীড়ন ও অপমান সহ্য করিতে হয় তাহার সকরুণ কাহিনী কারাগারের উচ্চ প্রচীর ডিঙ্গাইয়া বড় একটা বাহিরের লোকের কানে প্রবেশ করিতে পারে না। এক্ষেত্রেও অভিযুক্তদের মর্মান্তিক দুরবস্থার কথা যাহাতে বাহিরের লোক জানিতে না পারে তাহার জন্য সরকার যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদিগের পক্ষে অভিযুক্তদের সঙ্গে আলাপ করা নিতান্তই অসম্ভব ছিল, এমন-কি, আদালতের দৈনন্দিন ঘটনাবলীর বিবরণও তাহারা যথাযথভাবে জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিতে পারিত না, করিলেই সি, আই, ডি পুলিশের কৃপাদৃষ্টি প্রেস প্রতিনিধিকে পদে পদে অনুসরণ করিয়া তাহার গতিশক্তিকেই পঙ্গু করিয়া ফেলিত। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজনগণও শৃঙ্খলিত বন্দীদের সঙ্গে দেখা করিতে পারিত না। কেবল তাহাই নহে। ইংরাজের ভারত সাম্রাজ্যে রাজদ্রোহীর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক থাকাও সি, আই, ডি পুলিশের চোখে গুরুতর অপরাধ এবং এই অপরাধে কাকোরী মামলার আসামীদিগের আত্মীয়গণকেও কতই না লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে।

কারাগারে এই হতভাগ্য বন্দীদিগের কষ্টের পরিসীমা ছিল না। অন্যান্য কয়েদী হইতে ইহাদিগকে পৃথক করিয়া এক ভিন্ন গৃহে রাখিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল; সে গৃহ বর্ষার জলে ভাসিয়া যাইত। কত

দুর্যোগময়ী বাদল রাত্রিতে বৃষ্টিধারা হইতে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া এই হতভাগ্যদিগকে গৃহকোণে বসিয়া বসিয়া রাত কাটাইতে হইয়াছে। ভদ্রলোকের সন্তান ইহারা, খাদ্যের নামে ইহাদিগের সম্মুখে যে সমস্ত জঘন্য সামগ্রী উপস্থিত করা হইত, তাহা চোখে দেখিলে বোধ হয় ইহাদের আত্মীয়-স্বজন চোখের জল সম্বরণ করিতে পারিত না। ইহার উপর জেলকর্মচারীদিগের নৃশংস ব্যবহার। দেহকে অনশনে রাখিয়া হয় তো বা মানুষ কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু মনকে অনশনে রাখিয়া জীবন-ধারণ করা অসহ্য। দেহের লাঞ্ছনা বরং হাসিমুখে সহ্য করা যায়, কিন্তু শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত মন দৈনন্দিন অপমানের বোঝা বহিয়া বহিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। কাকোরী মামলার আসামীদিগের পক্ষে জেল-কর্মচারীদিগের দুর্ব্যবহার, আহার-বাসস্থান সম্বন্ধীয় অসুবিধা অপেক্ষাও অধিক পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা বোমার মামলার আসামী, সরকারের চক্ষে তাহারা হিংস্রজন্তু অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর; তাই ইহাদের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি পুলিশ কর্মচারিগণের চক্ষে নিরাপদ বলিয়া মনে হইত না। প্রথম হইতেই কোর্টে লইয়া আসিবার সময় ইহাদিগকে হাতে হাতকড়ি পরাইয়া আনা হইত, এইবার পায়ে বেড়ি লাগাইবারও বন্দোবস্ত করা হইল। এ ব্যবস্থা আসামীগণের আত্মাভিমানে আঘাত করিল, তাঁহারা পায়ে বেড়ি পরিতে অস্বীকার করিলেন, কিন্তু পুলিশ নাছোড়বান্দা। বাধ্য হইয়া ইহারা অনশনব্রত অবলম্বন করিলেন। তাহাদের এই দৃঢ়তার নিকট অবশেষে পুলিশকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। ৪৮ ঘণ্টা পর তাহারা বেড়ি পরাইবার দাবী প্রত্যাহার করিলে ইহারা আহার্য গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু অন্যান্য অত্যাচার উৎপীড়ন নিরবচ্ছিন্নভাবেই চলিতে লাগিল। যুক্ত-প্রদেশের সরকারের নিকট প্রতিবিধান প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন-

পত্র পাঠান হইল, কোন উত্তর আসিল না। কারাগারসমূহের ইন্‌স্‌পেক্টর-জেনারেলের নিকট অভিযোগ করা হইল, কোন ফল হইল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া ইহাদিগকে পুনরায় অনশনব্রত অবলম্বন করিতে হইল। সরকার পক্ষ হইতে এই ব্যাপারকে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টার ত্রুটী হইল না, কিন্তু সমস্ত সতর্কতা সত্ত্বেও ইহা বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িল। দেশীয় কাগজে সরকারী হৃদয়-হীনতার তীব্র সমালোচনা বাহির হইতে লাগিল, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ অভিযুক্তদের অভাব-অভিযোগের প্রতীকার করিবার জন্য বাহিরে সরকারকে চাপ দিতে আরম্ভ করিলেন। আবার সত্যের জয় হইল, সরকার ইহাদের অভাব-অভিযোগের যথাসম্ভব প্রতীকার করিতে স্বীকৃত হইলেন। সুদীর্ঘ বিংশতি দিবস পর সত্যাগ্রহীগণ আহার্য গ্রহণ করিলেন। একা বনোয়ারীলাল ভিন্ন অপর সকলেই এই অনশন ব্রতে যোগদান করিয়াছিলেন।

এই সমস্ত ব্যাপারে অভিযুক্তদের সকলেরই স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। শেঠ দামোদর স্বরূপের অবস্থাই সর্বাপেক্ষা অধিক শোচনীয় হইয়া উঠিল। আজীবন বিলাসের কোলে লালিত পালিত শেঠজী কারাগারের দুর্বিষহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিলেন না। প্রথমে শারীরিক অবস্থা সামান্য খারাপ হইল, কারাগারে চিকিৎসার কোনই সুবন্দোবস্ত হইল না। ক্রমশঃ শেঠজী শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। কিন্তু এমতাবস্থায়ও তাঁহাকে প্রত্যহ ১০টা হইতে ৪টা পর্যন্ত আদালতে উপস্থিত থাকিয়া বিচারের অভিনয় দেখিতে হইত। এইরূপ নানাপ্রকার অনিয়ম ও অত্যাচারে তাঁহার অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হইতে চলিল, সরকারও স্বভাবসুলভ হৃদয়হীনতা-বশতঃ তাঁহার সুচিকিৎসার কোনই বন্দোবস্ত করিলেন না। অবশেষে একদিন হঠাৎ তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িল। বাধ্য হইয়া তখন সরকার তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য

এক বোর্ড নিযুক্ত করিলেন। অন্যান্য সরকারী বোর্ডের মত এ বোর্ডও অনেক গবেষণার পর সরকার পক্ষে রায় দিলেন—শেঠজী আদালতে নিয়মিত হাজির হইবার উপযুক্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মানুষের স্বাস্থ্য সরকারী ডাক্তারের হুকুম মানিয়া চলিতে চায় না। তাই বোর্ডের উক্তরূপ রায় হওয়া সত্ত্বেও শেঠজীর স্বাস্থ্যের কোন প্রকার উন্নতি হইল না, বরং উত্তরোত্তর পূর্বাপেক্ষা শোচনীয় হইতে লাগিল। বাহিরে জনসাধারণ এবং ভিতরে অভিযুক্তগণ আবার সরকারের এই নির্দয় হৃদয়হীনতার প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। তখন সরকার তাঁহাকে বায়ু-পরিবর্তনের জন্য প্রথমে বেরিলী জেলে এবং অতঃপর দেরাদুন জেলে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু জেলের বায় সর্বত্রই একপ্রকার। স্থান পরিবর্তনের নামে জেল-পরিবর্তনে শেঠজীর স্বাস্থ্যের কোনই উন্নতি হইল না। অবশেষে দুই হাজার টাকা নগদ জমা এবং দুই হাজার টাকার জামীন লইয়া সরকার তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিলেন। তখন হইতে আজ পর্যন্ত শেঠজী স্বাস্থ্য লাভার্থ অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সভ্য ইংরাজের কারাগারে সভ্য কর্মচারীদের নৃশংস ব্যবহারে একবার যে স্বাস্থ্য তাঁহার ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে সেই লুপ্ত স্বাস্থ্য তিনি আর ফিরিয়া পান নাই। সুখের বিষয় এতদিন পর সরকার একটী প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছেন—শেঠজীর বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

দেশপ্রীতির অপরাধে যাহাদিগকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয় তাহাদের কারাজীবনের দুইটী দিক থাকে। দুঃসহ কারাক্লেশের মধ্যেও তাহারা নির্মল আনন্দের সন্ধান পান। জীবনের যথাসর্বস্ব পণ করিয়া যাহারা দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া যখন আপনাদের জীবন মরণের একমাত্র সাথীদিগকে তাঁহাদেরই অবস্থায় তাঁহাদের চারিদিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতে

পান তখন এই সঙ্গসুখকে নিঙড়াইয়া ইহার সমস্তটুকু রস আকণ্ঠ পান করিয়াই তাঁহারা পরম তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। কাকোরী মামলার আসামীগণও তাই এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও সুখ-সম্ভোগের উপাদান খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। দেশের জন্য দুঃখ সহিবার পরম গৌরবময় আনন্দে হৃদয় তাঁহাদের কানায় কানায় পরিপূর্ণ, অদূরে গরিমাময় মৃত্যুর ভীষণ মধুর মুখখানি জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে—তাই জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়টিকে তাঁহারা হাসিয়া খেলিয়া কাটাইয়া দিতেই মনস্থ করিয়াছিলেন। আদালতে যখন সাক্ষীর পর সাক্ষী আসিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বোঝাটিকে ভারী করিয়া যাইত তখন তাঁহারা সেদিকে কর্ণপাত মাত্র না করিয়া আপন মনে হয়তো-বা কাহারও ছবি আঁকিয়া, কাহারও আকৃতি-প্রকৃতি-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া, না-হয় শিকল বাজাইয়া গুণ গুণ স্বরে গান গাহিয়া পরম নিশ্চিন্ত আনন্দেই কাল কাটাইত। লরি বোঝাই করিয়া তাঁহাদিগকে যখন আদালতে লইয়া আসা হইত বা আদালত হইতে ফিরাইয়া জেলে লইয়া যাওয়া হইত তখন তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য রাজপথের উভয় পার্শ্বে লোক আর ধরিত না। পর্দানশীন রমণীগণ ঘরের ছাদে অথবা বাতায়ন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মমতাভরা প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া থাকিত। কয়েদীরা গান গাহিয়া আসিত, রাস্তায় বালকেরা বন্দুকধারী পুলিশ-প্রহরীকে তুচ্ছ করিয়া বন্দীদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিয়া উঠিত। তাহাদের সমবেত কণ্ঠের 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি নগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বায়ুহিল্লোলে তরঙ্গায়িত হইয়া ভাসিয়া যাইত।

বাহিরের আন্দোলনের মুখ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সরকার বন্দীদিগকে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে পুস্তক

দেওয়া হইয়াছিল, বাদ্যযন্ত্র ও খেলিবার উপকরণ দেওয়া হইয়াছিল, খাদ্যসামগ্রী রন্ধন করিয়া লইবার ভারও বন্দীদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাই জেল হইতে ফিরিয়া গিয়া কেহ-বা ব্যায়াম করিত, কেহ-বা টেনিস ব্যাডমিণ্টন খেলিয়া সময় কাটাইত। রাত্রিতে আহারাদির পর অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ব্যক্তিগণ রাজনীতি, ধর্ম বা দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে গভীরভাবে আলোচনা করিতেন, অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ছেলেরা গান-বাজনা করিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিত। রাজকুমার, রামদুলারে এবং রাজেন্দ্র লাহিড়ী চমৎকার গান গাহিতে পারিত। ইহাদের সুললিত কণ্ঠের গান শুনিয়া জেলের অন্যান্য সাধারণ কয়েদীরাও মোহিত হইয়া যাইত। সুরেশ বাবু রন্ধন-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। রবিবার বা অন্যান্য ছুটীর দিনে তিনি পরম যত্নের সহিত নানাপ্রকার সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া সকলকে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করাইতেন। সরস্বতী পূজা এবং হোলীর সময় জেলের মধ্যে উৎসাহ ও আনন্দের অবধি থাকিত না।

যাহা হউক, অবশেষে এই মামলার শুনানী শেষ হইল। সরকার পক্ষে পণ্ডিত জগৎনারায়ণ সুদীর্ঘ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া হ্যামিল্‌টন সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন যে, অভিযুক্তগণ সকলেই অতি ভয়ংকর লোক, তাহারা না করিতে পারে এমন অপকর্ম সংসারে নাই, তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দিলে শান্তিপ্রিয় রাজভক্ত প্রজাদের ধনপ্রাণ বিপন্ন করা হইবে, এমন-কি ভারতে ইংরাজ-রাজত্বের অবসান হওয়াও বিচিত্র নহে। পণ্ডিত জগৎনারায়ণের বাগ্মীতার নিকট, প্রতিপক্ষীয় উকীলের বাগ্মীতা ম্লানহইয়া গেল। হ্যামিলটন সাহেবের মুখ দেখিয়া কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না যে মামলার ফল কি হইবে।

১৯২৭ সালের ৬ই এপ্রিল মামলার রায় বাহির হইল। সেদিন আদালতে লোক আর ধরে না, সকলের মুখেই ভয়মিশ্রিত

উত্তেজনার চিহ্ন দেদীপ্যমান হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। জনতার সংখ্যা দেখিয়া পুলিশ-প্রহরীর সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হইল। বোধ হয় ভয়ে, পণ্ডিত জগৎনারায়ণ সেদিন আর আদালতে উপস্থিত হইলেন না, বাহিরের বিরাট জনতা লক্ষ্য করিয়া জজ সাহেবেরও মুখ শুকাইয়া গেল। সাদা কাপড় পড়িয়া টিকটিকির দল জনতার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, যদি কোন শিকারের সন্ধান পাওয়া যায়।

১১॥টার সময় বন্দীদিগকে আদালতে উপস্থিত করা হইল। যাহাদের জন্য এত উদ্যোগ-আয়োজন তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া জনতার বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না। সে মুখে উদ্বেগ বা আশঙ্কার চিহ্নমাত্র নাই, বরং প্রশান্ত আনন্দরেখা জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে।

জজসাহেব কলের পুতুলের মত আপনার রায় পাঠ করিয়া গেলেন। তিনি প্রারম্ভেই বলিলেন যে অভিযুক্তগণ স্বার্থসিদ্ধির হীন উদ্দেশ্য লইয়া কোন অন্যায় কার্য করে নাই, তাই তাহারা কোন নৈতিক অপরাধে অপরাধী নয়। তাহারা রাজবন্দী। রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র গুরুতর অপরাধ, আইন অনুসারে সে অপরাধের শাস্তি চরম দণ্ড। তারপর তিনি কম্পিত-কণ্ঠে বিভিন্ন আসামীর প্রতি দণ্ডাদেশ শুনাইয়া দিলেন।

শ্রীরামপ্রসাদ—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও প্রাণদণ্ড; শ্রীরোশন সিং পাঁচ পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ও প্রাণদণ্ড, শ্রীবনোয়ারীলাল প্রত্যেক ধারা অনুসারে পাঁচ পাঁচ বৎসরের কারাদণ্ড, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রত্যেক ধারা অনুসারে পাঁচ পাঁচ বৎসরের কারাদণ্ড; শ্রীগোবিন্দচরণ কর দশ বৎসরের কারাদণ্ড; শ্রীমুকুন্দলাল—ঐ; শ্রীযোগেশচন্দ্র চাটার্জি—ঐ; শ্রীমন্মথনাথ গুপ্ত—১৪বৎসরের কারাদণ্ড; শ্রীপ্রেমকিষণ খান্না—পাঁচ বৎসরের কারাদণ্ড; শ্রীপ্রণবেশ চাটার্জি—ঐ; শ্রীরাজকুমার

সিংহ দশবৎসরের কারাদণ্ড; শ্রীরামদুলালের ত্রিবেদী পাঁচ বৎসরের কারাদণ্ড; শ্রীরামকিষণ ক্ষেত্রী—১০ বৎসরের কারাদণ্ড; শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর: শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—৭ বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড; ও শ্রী বিষ্ণুশরণ দুবলিস—ঐ।

কোন প্রকার প্রমাণ না থাকাতে শ্রীহরগোবিন্দ ও শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে মুক্তি দেওয়া হইল। রাজসাক্ষী বাণারসীলাল ও ইন্দুভূষণ বিশ্বাস-ঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ মুক্তি পাইল।

জজসাহেব দণ্ডাজ্ঞাপাঠ সমাপ্ত করিয়া নীরব হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কারাগৃহ 'বন্দেমাতরম্' 'ভারত মাতাকী জয়' প্রভৃতি জয়ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল, বাহিরের জনতাও বিক্ষুব্ধ, চঞ্চল। বন্দীদিগকে একে একে বাহিরে আনা হইল। সকলেই মনে মনে বুঝিতে পারিলেন যে এইবার পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! কাহারও মুখে কথা নাই, সে মুখে আত্মবলিদানের গর্ব আছে, আত্মাভিমান নাই; সে মুখে আসন্ন বন্ধু-বিচ্ছেদের দুঃসহ বেদনার ছায়া ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কাপুরুষোচিত ভয়ের চিহ্নমাত্রও নাই। গাড়িতে উঠিবার সময় বন্দিগণ পরস্পর পরস্পরকে প্রণামালিঙ্গন করিল—সকলেরই চোখে জল, মুখে হাসি। এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া সমবেত সহস্র জনতার চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল। হায়রে পরাধীন দেশ, এদেশে এমন-সব মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণের মূল্য কুকুর বেড়ালের প্রাণের চাইতেও অধিক নয়!

ঘন ঘন 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির মধ্যে মোটর লরি বন্দীদিগকে লইয়া কারাগারের দিকে চলিয়া গেল। সেই দিন অপরাহ্নেই যুক্ত-প্রদেশের সরকারের আদেশে বন্দীদিগকে ভিন্ন ভিন্ন জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

ইতিমধ্যে এই মামলায় অপর দুই জন আসামী আসফাকউল্লা খান ও শ্রীশচীন্দ্রনাথ বক্সী ধরা পড়িল—এক জন দিল্লীতে ও অপর জন ভাগলপুরে। ইহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীপ্রমাণ সব মজুদ ছিল, অতি অল্প কালের মধ্যেই তাহাদের বিচার হইয়া গেল। দণ্ডাজ্ঞা হইল—আসফাক উল্লার ফাঁসী ও শ্রীশচীন্দ্রনাথের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

সেসন জজ তাহার রায়ে বলিয়াছিলেন যে, অযোধ্যা চীফ কোর্টের মঞ্জুরি ভিন্ন ফাঁসীর দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদিগকে ফাঁসী দেওয়া হইবে না এবং অন্যান্য আসামীগণ ইচ্ছা করিলে ৭ দিনের মধ্যে নিম্ন আদালতের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারেন। ভূপেন সান্যাল, শচীন সান্যাল ও বনোয়ারীলাল ভিন্ন অপর সকলেই আপীল করিলেন। পক্ষান্তরে ইহাদের দণ্ডকাল বৃদ্ধি করিয়া দিবার জন্য সরকার পক্ষ হইতেও আপীল রুজু হইল।

অযোধ্যা চীফ্ কোর্টের চীফ্ জাষ্টিস্ সার লুই ষ্টুয়ার্ট এবং জাষ্টিস্ মহম্মদ রেজা সাহেবের এজলাসে ১৮ই জুলাই আপীলের শুনানী আরম্ভ হইল। সরকার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য পণ্ডিত জগৎ নারায়ণকেই পুনরায় নিযুক্ত করা হইল। ফাঁসীর দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত রামপ্রসাদ, রাজেন্দ্র ও রোশন সিংএর পক্ষ সমর্থনের জন্য সরকারের তরফ হইতেই শ্রীলক্ষ্মীশঙ্কর মিশ্র, মিঃ এস, সি, দত্ত ও শ্রীজয়করণ নাথ মিশ্র নিযুক্ত হইলেন। বন্দিগণ আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আরও ভাল উকিল প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল না। রামপ্রসাদ লক্ষ্মীশঙ্করের সাহায্য অস্বীকার করিয়া স্বয়ং স্বীয় মামলার সওয়াল-জবাব করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু সরকার অচল অটল! ফলে সরকারী বেতনভোগী উকিল সরকারের নির্দেশ না হইলেও অভিলাষ অনুযায়ী সওয়াল জবাব করিলেন। ২২শে আগষ্ট আপীলের

রায় বাহির হইল। রামপ্রসাদ, রাজেন্দ্র লাহিড়ী, রোশন সিং ও আসফাক উল্লার ফাঁসীর হুকুম বহাল রহিল, যোগেশ চাটার্জি গোবিন্দ কর, ও মুকুন্দলালের দণ্ড বৃদ্ধি করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর করা হইল, সুরেশ ভট্টাচার্য ও বিষ্ণুশরণের দণ্ডও বৃদ্ধি করিয়া দশ বৎসর করা হইল। শ্রীরামনাথ পাণ্ডে ও শ্রীপ্রণবেশ চাটার্জির দণ্ড কমাইয়া যথাক্রমে তিন বৎসর ও চার বৎসর করা হইল। অন্যান্য আসামীদের দণ্ড পূর্ববৎই থাকিয়া গেল।

চার চারটি তরুণ প্রাণ এমনভাবে ব্যর্থ হইয়া যাইবে মনে করিয়া দেশের ছোট-বড় সকলেই দুঃখিত হইল। স্বদেশপ্রেম ভুল পথে চলিলেও স্বদেশপ্রেম। জীবন-মৃত্যু তুচ্ছ করিয়া যাহারা দেশের কাজে অগ্রসর হইতে পারে তাহাদিগকে অকাল-মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য দেশবাসী ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ১৭ই সেপ্টেম্বর ইহাদের ফাঁসীর দিন ধার্য হইয়াছিল। যুক্ত-প্রদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্য ঠাকুর মনজীত সিং ফাঁসীর পরিবর্তে ইহাদিগকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পাঠাইবার এক প্রস্তাব কাউন্সিলে পেশ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই প্রস্তাবের আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত যাহাতে ইহাদের ফাঁসী স্থগিত থাকে তাহার জন্যও সরকারের নিকট প্রার্থনা করা হইল। এদিকে যুক্ত-প্রদেশীয় কয়েক-জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মিলিয়া স্বয়ং লাট সাহেবের নিকট ইহাদের জন্য প্রাণভিক্ষা করিলেন। ইংরাজ লাট সাহেবের প্রাণে রাজদ্রোহী ভারতবাসীর জন্য দয়া হইল না, তবে ১১ই অক্টোবর পর্যন্ত ফাঁসী স্থগিত রহিল। ব্যবস্থাপক সভায় এই সম্বন্ধে আলোচনাও হইল, বে-সরকারী অনেক সদস্য এই সমস্ত ভ্রান্ত স্বদেশপ্রেমিকের জন্য দয়া

প্রার্থনা করিলেন, সরকার আপনাদের সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হইলেন না। ফাঁসীর দণ্ড কায়েম রহিল।

একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য মৃত্যুপথের এই যাত্রী কয়জন প্রীভি কাউন্সিলে আপীল করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই আপীল উপলক্ষে আবার ফাঁসীর দিন পরিবর্তিত হইল। দেশবাসী প্রথম হইতেই এই মোকদ্দমায় আসামীদের পক্ষ সমর্থন করিবার অর্থ যোগাইয়া আসিতেছিল। এই শেষ আপীলের ব্যয় নির্বাহ করিবার দায়িত্বও তাহারা সানন্দে মাথায় তুলিয়া লইল। জনসাধারণের অর্থে প্রীভি কাউন্সিলে আপীল রুজু হইল। পোলক সাহেব এই সময়ে ইংলণ্ডে ছিলেন। তিনি আসামী পক্ষে মামলার তদারক করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। প্রীভি কাউন্সিল ঘটনার সত্যাসত্য সম্বন্ধে বিবেচনা করে না। যথাযথভাবে আইনের প্রয়োগ হইয়াছে দেখিতে পাইয়া বিচারকগণ চীফ কোর্টের দণ্ডাদেশ বহাল রাখিলেন। যথাসময়ে আসামীগণ জানিতে পারিলেন যে তাহাদের চরম দণ্ডের পরিবর্তন হইবে না।

মানুষ সহজে আশা ছাড়িতে চায় না। তাই দেশের নেতাগণ একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার সঙ্কল্প করিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রমুখ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার নেতৃস্থানীয় কয়েকজন সদস্য স্বয়ং বড়লাটের নিকট এই হতভাগ্যদের জন্য প্রাণভিক্ষা করিলেন। কিন্তু পাষাণ গলিল না। প্রাণহীন সরকারী যন্ত্রের অংশবিশেষ বড়লাট বাহাদুর আইনকে অগ্রাহ্য করিয়া হৃদয়কে প্রশ্রয় দিতে স্বীকৃত হইলেন না। মৃত্যুদণ্ডের কোনই পরিবর্তন হইল না। বন্দিগণ স্বয়ং সম্রাটের নিকটও দয়া ভিক্ষা করিয়া আবেদন করিল; সম্রাট তাহাদের সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। এইবার সব ফুরাইল।

ইতিমধ্যে কারাগারে বন্দীদিগকে দিনের পর দিন যে সমস্ত নির্যাতন ভোগ করিতে হইতেছিল অবান্তর বোধে আমরা তাহার উল্লেখ করিলাম না। বিদেশী রাজার কারাগারে স্বদেশ-প্রেমিকের নির্যাতন নিতান্তই স্বাভাবিক ঘটনা। তাহার জন্য নালিশ করিলে কোন ফল হয় না, বোধ হয় নালিশ করা সাজেও না। দেশমাতার পবিত্র চরণে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ কাকোরীর বীর বন্দিগণ দুঃসহ দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়া আপনাদের কারাজীবনের তরণী যেমন করিয়াই হউক বাহিয়া চলিতেছিল।

ইহার পরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। চারিজন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত রাজবন্দী দেখিতে পাইলেন যে তাঁহাদের জন্য "অমর মরণ রক্ত চরণ নাচিছে সগৌরবে।" সে চরণতলে লুটাইয়া পড়িতে তাহাদের হৃদয় কাঁপিল না, বরং গৌরবে স্ফীত হইয়া উঠিল। দেশের কাজের জন্য যাহারা সর্বস্ব পণ করিয়াছে, মরণকে তাহারা ভয় করিবে কেন? যুগে যুগে, দেশে দেশে নিঃশেষে আপনাদের প্রাণ ঢালিয়া দিয়া যাহারা দেব-বাঞ্ছিত অমরত্বের অধিকারী হইয়াছে পরলোকে তাহাদেরই সঙ্গে একাসনে বসিবার সৌভাগ্য লাভ করিবার জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া এই মৃত্যুঞ্জয়ী বীর-চতুষ্টয় আসন্ন মৃত্যুর জন্য হাসিমুখে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। জীবনেরই অপর রূপ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে কাহারও হৃদয় টলিল না।

১৯২৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর গোণ্ডা জেলে রাজেন্দ্র লাহিড়ীর ফাঁসী হইয়া গেল। ১৯শে ডিসেম্বর রামপ্রসাদ, রোসন সিং এবং আসফাক উল্লা খাঁরও জীবন-নাটকের অবসান হইল। রাজরোষে ভারতমাতার এই চারিজন কৃতী সন্তানের অমূল্য জীবনকোরকগুলি অকালে শুকাইয়া গেল।

আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে এই মহা-নাটকের কয়েকজন অভিনেতার সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিব। সরকারী নীতিরই অবশ্যম্ভাবী ফলে অকালে ইহাদের জীবন-নাটকের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। বাঁচিয়া থাকিয়া মুক্ত স্বাধীনভাবে দেশসেবার সুযোগ পাইলে ভবিষ্যতে যে-কোন লেখক ইহাদের জীবনচরিত লিখিয়া ধন্য হইতে পারিত। কিন্তু ইহারা কাজ করিবার সুযোগ পায় নাই, তাই ইহাদের জীবনে কাহিনী নাই। কিন্তু দেশ-সেবাকেই যে-সমস্ত কিশোর-কিশোরী জীবনের ব্রত করিতে চান তাহারা ইহাদের জীবন আলোচনা করিয়াও যথেষ্ট উপকৃত হইতে পারিবেন। মানুষ কর্মের দ্বারা বড় হয় বটে কিন্তু ভাব না থাকিলে কর্ম করিবার প্রেরণা আসে না। এই বীর-চতুষ্টয় কর্ম করিবার সুযোগ পান নাই বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা ভাব-সম্পদে দরিদ্র ছিলেন না। তাঁহারা যে উজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা প্রত্যেক ভারতীয় কিশোর-কিশোরীরই অনুকরণযোগ্য।

শ্রীরামপ্রসাদ বিস্মিল

শ্রীরামপ্রসাদ বিস্মিল বিচারকের রায় অনুসারে যুক্তপ্রদেশীয় বৈপ্লবিকদিগের নেতা ছিলেন। তাঁহার সঙ্গীয় অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ নিঃসন্দেহ তাঁহার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত।

গরীবের ঘরে শাহজাহানপুর নগরে রামপ্রসাদের জন্ম হইয়াছিল, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে। তাঁহার পিতা শ্রীমুরলীধর প্রথমে মিউনিসিপালিটীতে মাসিক ১৪৲ টাকা বেতনে কাজ করিতেন। কিন্তু পুত্র যাঁহার স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য হাসিমুখে ফাঁসীকাষ্ঠে নিজের জীবন উৎসর্গ করিবে তিনি অনেক দিন চাকুরী জীবনের পরাধীনতা অকুণ্ঠিত চিত্তে হজম করিতে পারেন নাই। তাই অল্প কিছুদিন চাকুরী করিবার পর তিনি স্বাধীনভাবে আদালত-প্রাঙ্গণে ষ্ট্যাম্প বিক্রয়ের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার তিনটি গরুর গাড়ী ছিল ভাড়া দিয়া যাহা পাওয়া যাইত তাহার সহিত ষ্ট্যাম্প-বিক্রয়ের আয় মিলাইয়া দুঃখের সংসার তিনি কোনরকমে চালাইয়া লইতেন।

রামপ্রসাদের পূর্বে তাহার এক ভাইয়ের জন্ম হইয়াছিল, কিন্তু অল্পদিন পরেই তাহার মৃত্যু হয়। শিশুকালে রামপ্রসাদের স্বাস্থ্যও তেমন ভাল ছিল না। তাই তাহার দিদিমা তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য অনেক প্রক্রিয়া ও অনেক রকম ঔষধেরই সাহায্য লইয়াছিলেন। দুই একবার তাহার অত্যন্ত কঠিন পীড়াও হইয়াছিল। কিন্তু ভবিষ্যতে পরম গরিমাময় মৃত্যু যাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, সে রোগের

আক্রমণে পশুর মত মারবে কেন? রামপ্রসাদ সকল উপসর্গ কাটাইয়া মা ও দিদিমার স্নেহযত্নে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

সাত বৎসর বয়সের সময় মুরলীধর পুত্রকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উর্দু শিখিবার জন্য প্রেরণ করেন। প্রথমাবস্থায় লেখা-পড়া তাহার বড় ভাল লাগিত না। স্কুল পালাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, ফল চুরি করিয়া ও দাঙ্গা করিয়াই রামপ্রসাদ এই সময় দিন-রাত্রির বেশীর ভাগ সময় কাটাইয়া দিত! পিতা শাসন করিতেন, অত্যন্ত কঠোর শাসনই করিতেন। কিন্তু শাসনের ফলে রামপ্রসাদের কষ্টসহিষ্ণুতাই বৃদ্ধি পাইয়াছিল, অধ্যয়নের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায় নাই।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রামপ্রসাদের স্বভাবসুলভ দোষগুলি বরং বাড়িয়াই চলিতেছিল। কিশোর বালকের সুকোমল মস্তিষ্কগুলি চর্বণ করিবার মত লোকের অভাব কোন সহরেই হয় না; শাহজাহানপুরেও হয় নাই। রামপ্রসাদের একদল সঙ্গী জুটিয়াছিল। ইহাদের প্রভাবে পড়িয়া রামপ্রসাদ তামাক খাইতে আরম্ভ করে। সময়ে অসময়ে পিতার বাক্স হইতে অর্থ চুরি করিয়া সে নিজের এবং সঙ্গীদের জন্য তামাকের মূল্য সংগ্রহ করিত। এই কার্য করিতে যাইয়া সে দুইএকবার ধরা পড়িয়াছিল, ধরা পড়িয়া প্রহৃতও হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে তাহার স্বভাবের কোন পরিবর্তন হয় নাই। ইহার উপর আবার অপর একটি রোগের প্রাদুর্ভাব হইল। উর্দু সাহিত্যে তৃতীয়শ্রেণীর উপন্যাসের অভাব নাই। রামপ্রসাদ এই সমস্ত উপন্যাস পড়িবার বাতিকগ্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহার তরুণ বয়স—হৃদয়ের উদীয়মান প্রবৃত্তিগুলিকে বাতাস দিয়া জ্বালাইয়া তুলিবার মত সঙ্গীর অভাব হয় নাই, অশ্লীল উর্দু সাহিত্য বাসনায় ইন্ধন যোগাইতেছে, তাহার উপর আবার পিতামাতার বাক্স ভাঙ্গিয়া টাকা চুরি করিবার শিক্ষারও অভাব নাই—

রামপ্রসাদ দিনের পর দিন অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। দুইবার চেষ্টা করিয়াও সে উর্দু মিডল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না।

কিন্তু ভগবান তাহাকে বাল্যে দৈহিক মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, কৈশোরে তাহাকে নৈতিক মৃত্যুর কবল হইতেও উদ্ধার করিলেন। তাহাদের পাড়ায় এক ঠাকুরবাড়ী ছিল। এই সময়ে মন্দিরের ভার লইয়া এক নূতন পূজারী আসিলেন। কি এক অজ্ঞাত শক্তির ইঙ্গিতে ইহার সঙ্গে রামপ্রসাদের ভাব হইয়া গেল। এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই দুর্দান্ত বালকটি ঐ সচ্চরিত্র পুরোহিতের একান্ত বাধ্য হইয়া উঠিল।

রামপ্রসাদ পুরোহিতের সঙ্গে রোজ মন্দিরে যাইত। তাঁহাকে পূজা করিতে দেখিয়া ক্রমে ক্রমে সেও পূজা করিতে আরম্ভ করিল। পুরোহিত তাহাকে ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন, রামপ্রসাদ তাঁহার উপদেশ অমান্য করিতে পারিল না, ধীরে ধীরে তাহার প্রাণে নৈতিক চরিত্র সংশোধন করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। কিশোর রামপ্রসাদ নিয়মিত ব্যায়াম করিতে আরম্ভ করিল, প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে লাগিল, ধ্যান-ধারণার প্রতি অনুরাগ তাহার দিনের পর দিন বর্ধিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার কুপ্রবৃত্তিগুলিও মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। পরিণত বয়সে যে কঠোর আত্মসংযম তাহাকে মৃত্যুঞ্জয়ী হইবার শক্তি প্রদান করিয়াছিল, এই পুরোহিতের সংস্পর্শে তাহার ভিত্তি স্থাপিত হইল। পরবর্তীকালে রামপ্রসাদ আপনার বাক্য, কার্য ও লেখনীর সাহায্যে পবিত্র ব্রহ্মচারী জীবনের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেন।

রামপ্রসাদের ধর্ম ও নৈতিক জীবন গঠনে আর্য-সমাজের প্রভাব

বড় অল্প সাহায্য করে নাই ; বলিতে কি, আর্য-সমাজীয় সাধু মহাপুরুষদের সংস্পর্শে না আসিলে হয়ত বা তাহার জীবনের গতি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে পরিচালিত হইত। ইহাদিগের সংস্পর্শে আসিয়া রামপ্রসাদ স্বামী দয়ানন্দের 'সত্যার্থপ্রকাশ' পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থ পাঠেই তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। শাহজাহানপুরের প্রসিদ্ধ আর্য সমাজীয় পণ্ডিত মুন্সী ইন্দ্রজীৎজীর উপদেশে রামপ্রসাদ সত্যার্থ-প্রকাশে উল্লিখিত ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধীয় সমস্ত নিয়ম যথাযথ পালন করিতে অভ্যাস করিতে লাগিলেন। নিয়মিত ব্যায়াম করিয়া ইতিমধ্যেই তাহার যথেষ্ট শারীরিক উন্নতি সাধিত হইতেছিল! রামপ্রসাদ শুনিয়াছিলেন, বুঝিতেও পারিয়াছিলেন যে প্রচুর শারীরিক শক্তির অধিকারী না হইলে পরম শক্তিশালী ইন্দ্রিয়দিগের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না ; তাই শেষ পর্যন্ত তিনি যথোপযুক্ত ব্যায়াম হইতে বিরত হন নাই। ইহার উপর তিনি ব্রহ্মচারী জীবনের সমস্ত কঠোরতাই ধীরে ধীরে অভ্যাস করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি একখানি মাত্র কম্বলের উপর শয়ন করিতেন, শীতগ্রীষ্মনির্বিশেষে ব্রাহ্মমুহূর্তে গাত্রোত্থান করিয়া নিয়মিতরূপে ব্যায়াম, স্নান এবং ধ্যান-ধারণাদি করিতেন: রাত্রিতে আহার করিলে মনোসংযমের অসুবিধা হয় দেখিয়া তিনি রাত্রিতে আহার করাও ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এমন কি, বীর্য-ধারণের পরিপন্থী জানিয়া তিনি লবণ খাওয়া পর্যন্ত ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার এ কঠোর সাধনা সিদ্ধ হইয়াছিল, তিনি উর্ধ্বরেতা হইয়া ব্রহ্মচারী জীবনের নির্মল আনন্দ উপভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

রামপ্রসাদের পরিবর্তিত জীবনের গতিকে সুনির্দিষ্ট করিতে তাঁহার গুরুদেব স্বামী সোমদেব সরস্বতীর প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সন্ন্যাসী হইলেও স্বামীজীর অন্তর দেশের জন্য শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় কানায়

কানায় পরিপূর্ণ ছিল। তাই রামপ্রসাদ ইহার নিকট হইতে কেবল ধর্মের শিক্ষাই নহে, স্বদেশপ্রেমের শিক্ষাও লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা রামপ্রসাদের সহজ গুণ ছিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি যখন যে কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন তখন তিনি তাহা অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিকতার সঙ্গেই করিতেন। এই স্বভাবসুলভ একাগ্র নিষ্ঠা লইয়াই রামপ্রসাদ আর্য-সমাজে যোগদান করিয়াছিলেন। সনাতনপন্থী মুরলীধর পুত্রের এইরূপ ধর্মান্তর গ্রহণ পছন্দ করেন নাই। তাই রামপ্রসাদের আর্য-সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তাঁহার পিতা ততই তাঁহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন তিনি পুত্রকে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিলেন যে, হয় আর্য-সমাজ ছাড়িতে হইবে, না হয় ঘর ছাড়িতে হইবে। রামপ্রসাদ অন্তরের বিশ্বাসকে উপেক্ষা করিয়া ঘরে থাকিতে সম্মত হইলেন না, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা মাত্র না করিয়া একবস্ত্রে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। পিতা অবশ্য এতটা আশঙ্কা করেন নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সত্যসত্যই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া মায়ের প্রাণও ধৈর্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারিল না। পরদিন তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা হইল। মাতাপিতার নির্বন্ধাতিশয্যে রামপ্রসাদ ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর মুরলীধর আর পুত্রের ধর্মমত পরিবর্তন করাইতে কোন চেষ্টা করেন নাই।

রামপ্রসাদের চরিত্র গঠনে তাঁহার জননীও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি সদা-সর্বদাই পুত্রকে ধর্ম-চর্চায় উৎসাহিত করিতেন। আর্য-সমাজে যোগদান করিতে যাইয়া রামপ্রসাদ মাতার নিকট হইতে কোনদিনই বাধা প্রাপ্ত হন নাই। রামপ্রসাদকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠাইবার মূলেও ছিলেন তাহার জননী। স্বদেশ-সেবা কার্যেও রাম-

প্রসাদ তাঁর জননীর নিকট হইতে যথেষ্ট উৎসাহ পাইতেন। পুত্র বিপ্লব-বাদীদিগের দলে যোগদান করিয়াছে ইহা তাহার মায়ের অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু জননীসুলভ স্নেহের বশে পুত্রকে নিরস্ত করা দূরে থাকুক, তিনি তাহাকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতেন। পরবর্তীকালে জননীর প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই রামপ্রসাদ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তাঁহার প্রশংসায় প্রবৃত্ত হইতেন। বস্তুত এমন বীরজননী না হইলে রামপ্রসাদের মত বীর পুত্রের জন্ম সম্ভব হয় না।

উর্দু স্কুলে বারবার অকৃতকার্য হইবার পর পত্নীর নির্বন্ধাতিশয্যে মুরলীধর পুত্রকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতঃপর রামপ্রসাদ মনোযোগের সহিতই লেখা-পড়া করিতেছিলেন। বিপ্লবদলে যোগদান করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত না হইলে হয়ত-বা তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রই হইতে পারিতেন। কিন্তু ভগবান অন্য পথেই তাহার জীবনকে গৌরবময় করিয়া তুলিবেন বলিয়া গতানুগতিক পথে তিনি অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

রামপ্রসাদ বাল্যকাল হইতেই দেশের দুঃখদুর্দশার কথা চিন্তা করিতেন। দেশবাসীর নিদারুণ দারিদ্র্য ও জঘন্য লজ্জাকর কাপুরুষতার জন্য তিনি অন্তরে অন্তরে প্রচলিত শাসন-পদ্ধতিকে দোষী সাব্যস্ত না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। বিশেষ করিয়া অস্ত্র-আইনের কড়াকড়ি নিয়মগুলি তিনি কিছুতেই স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাহার স্বতঃই মনে হইত যে, জাতিকে যদি পদে পদে এমনই করিয়া অপরের মুখের দিকে চাহিয়া বাঁচিয়া থাকিতে বাধ্য করা না হইত তাহা হইলে আর যাহাই হউক না কেন, তাহার কাপুরুষতা এমন ভাবে নির্লজ্জতার চরম সীমায় গিয়া উপস্থিত হইতে পারিত না। আর্যবীরদিগের বীরত্ব কাহিনী পড়িতে পড়িতে তাহার তরুণ প্রাণ

কল্পনার রঙে রাঙা হইয়া উঠিত—হায়রে, সেও যদি রাণা প্রতাপ সিংহের মতই ঘোড়ায় চড়িয়া বর্শা হাতে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিত! ইংরাজ সেনানায়কের আদেশে ভারতীয় সৈন্যদের কুচ-কাওয়াজ করিতে দেখিয়া তাহার দুঃখ হইত—ইহারা ক স্বাধীনতা-সংগ্রামে দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে? তাহাদিগকে বন্দুক ঘাড়ে করিয়া সদর্পে চলিতে দেখিয়া তাহারও বন্দুক কিনিবার সখ হইত, আর তখনই মনে পড়িত অস্ত্র আইনের কড়াকড়ি নিয়মের কথা।

রামপ্রসাদের বয়স যখন ১৮ বৎসর তখন তিনি ভগ্নীর বিবাহ উপলক্ষে একবার গোয়ালিয়র গমন করেন। বিবাহের দিন শুনিতে পাইলেন যে বরযাত্রীদের সঙ্গে অনেক নর্তকী আসিয়াছে। ইহার পর আর তাহার বিবাহ দেখিবার প্রবৃত্তি হইল না। জননীর নিকট হইতে কিছু টাকা লইয়া বাড়ী ফিরিবার জন্য তিনি পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। ইতিপূর্বে তিনি শুনিয়াছিলেন যে, গোয়ালিয়র রাজ্যে সহজেই আগ্নেয়াস্ত্র কিনিতে পাওয়া যায়। আজ গোয়ালিয়রের পথে চলিতে চলিতে রিভলবার কিনিবার প্রবল ইচ্ছা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া ৭৫৲ টাকা মূল্যে রামপ্রসাদ এক পাঁচনালী রিভলভার খরিদ করিয়া ফেলিলেন। অব্যর্থলক্ষ্য বলিয়া বিপ্লবদলে রামপ্রসাদ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই আগ্নেয়াস্ত্রের প্রতি এমন অনুরাগ না থাকিলে হয়ত তিনি পরবর্তীকালে অমন সিদ্ধলক্ষ্য হইতে পারিতেন না।

এই সময় ভারতের রাজনৈতিকক্ষেত্রে অজ্ঞাত অখ্যাত কয়েকজন যুবক এক বিরাট রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করিতে ব্যাপৃত ছিলেন। টিকটিকির তৎপরতায় এবং দলের কয়েকজনের বিশ্বাসঘাতকতায় একে

একেএইরূপ অনেক ষড়যন্ত্রকারীদের দলই ধৃত হয়। ইহাদের বিচারকালে সংবাদপত্রে দিনের পর দিন যে-সমস্ত রোমাঞ্চকর ঘটনা প্রকাশিত হইত রামপ্রসাদ তাহার উন্মুখ যৌবনের সমস্তটুকু একাগ্রতা দিয়া তাহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিতেন। অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে তাহার মনের মধ্যে বাসনা জাগিয়া উঠিতেছিল, যদি ইহাদের মত হইতে পারিতাম! লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার রায় বাহির হইবার পর এই ইচ্ছা সংকল্পে পরিণত হইল। আর্য-সমাজে ভাই পরমানন্দের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। বিচারক তাহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করিয়াছিলেন শুনিয়া ইংরাজ শাসনের প্রতি অনুরাগের শেষ রেখাটুকু রামপ্রসাদের অন্তর হইতে মুছিয়া গেল। রামপ্রসাদ প্রতিজ্ঞা করিলেন যেমন করিয়াই হউক ইহার প্রতিহিংসা লইতে হইবে।

ঐ দিন অপরাহ্নে তিনি আপনার গুরু স্বামী শ্রীসোমদেবজীর চরণতলে আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণনা করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞার কথাও বিবৃত করিলেন। স্বামীজী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "প্রতিজ্ঞা করা সহজ, রাখা কঠিন।'

রামপ্রসাদের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। গুরুদেবের চরণে প্রণাম করিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "আপনি আশীর্বাদ করুন, আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিব।"

স্বামীজী পরম স্নেহে শিষ্যের মস্তকে আশীর্বাদ বর্ষণ করিলেন।

(২)

তখনও রামপ্রসাদ বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন নাই, দেশে যে এইরূপ একটা আন্দোলন চলিতেছে দূর হইতে তাহার একটু আভাস পাইয়াছেন মাত্র। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে স্বদেশ-সেবার একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা প্রথম হইতেই প্রবল ভাবে জাগরূক ছিল। তাই

সুযোগ পাইলেই তিনি যে-কোন জনসেবক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলিয়া কাজ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভার অধিবেশন —সভাপতি স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ মজুমদার। নরম ও গরম দলের মধ্যে কাজ-চলা-গোছের একটা চুক্তি হইয়া গিয়াছে বটে কিন্তু গরম দল নরম দলের রাজনীতিকে স্বীকার করিয়া লয় নাই। সভাপতিকে অভিনন্দন প্রদান করিবার ব্যাপার লইয়া স্থানীয় নরম ও গরম দলের মধ্যে বেশ একটু মনকষাকষি চলিতেছিল। স্বর্গীয় লোকমান্যের প্রতিপত্তি অসীম। পাছে তাঁহার অভিনন্দন সভাপতির অভিনন্দন অপেক্ষা অধিক জাঁকজমকশালী হয় এই ভয়ে অভ্যর্থনা সমিতি সংকুচিত হইয়া উঠিয়াছিল। কর্মকর্তাগণ স্থির করিয়াছিলেন যে, লোকমান্য গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেই তাঁহাকে সহরতলী দিয়া ঘুরাইয়া বাসায় লইয়া যাওয়া হইবে, তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার সুবিধা জনসাধারণকে দেওয়া হইবে না। লক্ষ্ণৌ-এর চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ তথা যুবকগণ এই ব্যবস্থাকে মানিয়া লইতে স্বীকৃত হইল না।

রামপ্রসাদও কংগ্রেসে যোগদান করিবার জন্য লক্ষ্ণৌ আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের হৃদয়মণি লোকমান্যকে জনসাধারণের পক্ষ হইতে উপযুক্ত অভ্যর্থনা করা হইবে না, এ প্রস্তাব তাহার মোটেই ভাল লাগে নাই। বরং লোকমান্যের অভ্যর্থনা যাহাতে তাহার প্রতিপত্তি অনুযায়ী হইতে পারে তাহার জন্য তিনি অন্যান্য যুবকগণের সঙ্গে মিলিয়া বিরাট আয়োজন করিতে ব্যাপৃত ছিলেন। তাহার চরমপন্থী প্রাণ চরমপন্থী নেতার অবমাননা সহিতে পারে নাই।

যথাসময়ে লোকমান্য স্পেশাল ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে তাহাকে সজ্জিত মোটর গাড়ীতে নিয়া বসান হইল।

কিন্তু গাড়ী চলিতে পারিল না। রামপ্রসাদ ও অপর একজন যুবক গাড়ীর সম্মুখে চিৎ হইয়া পড়িয়া তাহার গতিবেগ রুদ্ধ করিল। তাহা-দিগকে অনেক বুঝান হইল, তাহাদের উপর দিয়া মোটর চালাইয়া দিবার ভয় প্রদর্শন করা হইল কিন্তু তাহারা স্থানত্যাগ করিল না। দেখাদেখি আরও অনেক যুবক তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিল। এদিকে লোকমান্যের আগমনবার্তা সহরময় ছড়াইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই সহর ভাঙ্গিয়া লোক আসিয়া ষ্টেশনে জড় হইতে লাগিল, ঘন ঘন "লোকমান্য কী জয়" শব্দে গগন পবন মুখরিত হইয়া উঠিল। অভ্যর্থনা সমিতির কর্মকর্তাগণ সবিস্ময়ে দেখিতে পাইলেন বাহিরে এক জনসমুদ্রের সমাগম হইয়াছে। সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া রামপ্রসাদ গাড়ীর তল হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিতে দেখিতে একখানি ঘোড়ার গাড়ী আনিয়া উপস্থিত করা হইল, লোকমান্যকে তাহাতে বসাইয়া দিয়া রামপ্রসাদের নেতৃত্বে জনসাধারণ গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া ফেলিয়া নিজেরাই গাড়ী টানিতে লাগিল। রামপ্রসাদের নির্ভীকতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সংগঠনশক্তি সেইবার নরমপন্থীদের আবাসস্থলে চরমপন্থীদের বিজয় ঘোষণা করিল।

এই লক্ষ্ণৌ নগরেই রামপ্রসাদ বিপ্লববাদীদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পান। লোকমান্যের অভ্যর্থনার ব্যাপারে রামপ্রসাদের কার্যাবলী বিপ্লববাদীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এই সবলদেহ, নির্ভীক এবং কর্ম্মঠ যুবকটিকে দলে টানিয়া লইবার লোভ তাহারা সংবরণ করিতে পারেন নাই। রামপ্রসাদও অনেক দিন হইতেই মনে প্রাণে বিপ্লবী হইয়া উঠিয়াছিল। তাই ইহাদের সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটিবামাত্র কিছুমাত্র ইতস্তত: না করিয়া তিনি ইহাদের দলে সর্বান্তঃকরণে যোগদান করিয়াছিলেন। বুদ্ধি ও তৎপরতাগুণে তিনি

অল্পকাল মধ্যেই এই দলের কার্যকরী সমিতির সভ্যপদে উন্নীত হন। আমরা পরে দেখিতে পাইব যে, স্বীয় চরিত্র ও কর্মকুশলতার গুণে তিনি পরে এক বিরাট বিপ্লবদলের অন্যতম প্রধান নেতা হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বিপ্লব দলে প্রবেশ করিয়াই রামপ্রসাদ দেখিতে পাইলেন অর্থের অনটন। সংগঠন-কার্যের জন্য অর্থ চাই, কর্মীদিগকে সাময়িক সাহায্য করিবার জন্য অর্থ চাই, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্য অর্থ চাই। দলের অনেকেই ডাকাতি করিয়া অর্থসংগ্রহ করিবার পরামর্শ দিল। রামপ্রসাদ প্রথমে সম্মত হন নাই, পরে অবশ্য বাধ্য হইয়াই তাহাকে কয়েকবার ডাকাতি করিতে হইয়াছিল। এই ডাকাতি করা লইয়া বিপ্লববাদী-দিগকে শত্রুমিত্র উভয়েরই নিকট কত লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহিতে হয়। ইহারা জানে না যে বিপ্লববাদিগণ সাধ করিয়াই ডাকাতি করিতে চায় নাই। যাহাদের অর্থ আছে তাহারা মুক্তহস্তে দান করিতে স্বীকৃত হয় না বলিয়াই বিপ্লববাদীদিগকে অভাবের তাড়নায় ক্ষিপ্ত হইয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাজ চালাইবার উদ্দেশ্যেই ডাকাতি করিয়া অর্থ-সংগ্রহ করিতে হয়।

যাহা হউক, রামপ্রসাদ প্রথমে ডাকাতি না করিয়া সদুপায়েই দলের জন্য অর্থসংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারই পরামর্শে স্থির হয় যে, স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক পুস্তক প্রকাশ করিয়া তাহারই বিক্রয়-লব্ধ অর্থে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও দলের অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হইবে। প্রস্তাব অনুযায়ী 'আমেরিকার স্বাধীনতা' নামক একখানি পুস্তক লেখা হইল। কিন্তু পুস্তক প্রকাশ করিবার জন্য প্রথমে সামান্য কিছু অর্থের প্রয়োজন, তাহাই বা কোথা হইতে আসিবে? দলের সকলেই গরীব—ধনীর সন্তান কেহ কেহ থাকিলেও উপার্জনক্ষম কেহই নহে। অন্য কোন উপায়ে অর্থসংগ্রহের পন্থা দেখিতে না পাইয়া রামপ্রসাদ স্বীয়

জননীর নিকট হইতেই অর্থসংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিলেন। দুইশত টাকা হইলে একটি লাভজনক ব্যবসায়ে হাত দেওয়া যায় ইহা বলিয়া রাম-প্রসাদ মায়ের নিকট হইতে দুইশত টাকা আদায় করিয়া লইলেন। পুস্তক ছাপা হইল, বিক্রয়ও হইতে লাগিল। অন্য কোন দিকে টাকা ব্যয় হইবার পূর্বেই রামপ্রসাদ মায়ের নিকট হইতে ধার করা অর্থ ফিরাইয়া দিলেন। এই পুস্তক প্রকাশ করিবার অব্যবহিত পরেই "দেশ-বাসীর প্রতি নিবেদন" শীর্ষক আর একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করা হইল। দেশে পুস্তক দুইখানিরই আদর হইল বেশ। বিপ্লববাদ প্রচার করাই পুস্তক দুইখানির উদ্দেশ্য ছিল। তাই ইহাদের বহুল প্রচার সরকার নিশ্চিন্ত হইয়া সহ্য করিতে পারিলেন না। দুইখানি পুস্তকই বাজেয়াপ্ত করা হইল। সদুপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিবার পথে সরকারই বাধা প্রদান করিলেন।

সকলেই জানেন যে, নিষিদ্ধ ফলের জন্য মানুষের নিতান্তই একটা স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা থাকে। সেই জন্য সকল সময়েই বাজেয়াপ্ত পুস্তকের কাটতি কিছু বেশী হয়। 'আমেরিকার স্বাধীনতা' ও 'দেশবাসীর প্রতি নিবেদন' পুস্তক দুইখানি বাজেয়াপ্ত হইলেও বাজারে বেশ চলিতে ছিল এবং এই উপায়ে বিপ্লববাদীদিগের হাতে কিছু টাকাও আসিয়া পড়িয়াছিল। তাই এখন ইহারা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিবার দিকে মনোযোগ দিলেন। এই কার্যে রামপ্রসাদই সর্বাপেক্ষা অধিক দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেশীয় রাজ্যে সহজেই অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা যায় ইহা তাহারা জানিতেন। চেষ্টা করিয়া রামপ্রসাদ যে একটি রিভলবার ক্রয় করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন তাহাও আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং রামপ্রসাদেরই নেতৃত্বে তাহার সহকর্মীরা গোয়ালিয়র রাজ্য হইতে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

দেশীয় রাজ্যে আগ্নেয়াস্ত্র রাখিবার জন্য লাইসেন্স লইবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বিলাতী বারুদ এবং কার্তুজ সর্বত্র পাওয়া যায় না। ইংরাজ রেসিডেণ্টের অনুমতি ভিন্ন কোন দোকানদার এই সমস্ত জিনিসের ব্যবসায় করিতে পারে না এবং অনুমতি-পত্র প্রদর্শন না করিলে কাহারও নিকট ইহা বিক্রয় করা হয় না। বিলাতী বন্দুকের অনুকরণে দেশীয় রাজ্যে বন্দুক প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছে, এক প্রকার দেশী বারুদও সেখানে প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এই দেশী বারুদ কিংবা দেশী বন্দুক বিলাতী জিনিসের মত তেমন কার্যকরী হয় না।

যাহা হউক, রামপ্রসাদ এইরূপে অস্ত্র সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একে তাহারা যুবক, সংসার সম্বন্ধে তেমন অভিজ্ঞতা নাই; তাহার উপর আবার বিপ্লব কার্যের জন্য গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করিতে হইবে। তাই প্রথম প্রথম ইহাদিগকে খুব ঠকিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই অস্ত্র সংগ্রহ করিতে যাইয়া রামপ্রসাদ যে নির্ভীকতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ।

প্রথমেই রামপ্রসাদ এক দেশী দোকানদারের নিকট হইতে অস্ত্র ক্রয় করিবার চেষ্টা করিলেন। দেশী রিভলভার পাওয়া গেল বটে কিন্তু ভাল বিলাতী রিভলভার মিলিল না। অনেক ইতস্তত করিয়া ভয়ে ভয়ে রামপ্রসাদ দোকানদারকে কয়েকটি ভাল বিলাতী রিভলভার সংগ্রহ করিয়া দিবার অনুরোধ করিলেন। দোকানদার সম্মত হইল, কয়েক-দিন পরে একটি ভাল রিভলভারও সংগ্রহ করিয়া দিল। সে যে মূল্য দাবী করিল রামপ্রসাদ তাহাই প্রদান করিয়া উহা খরিদ করিলেন বটে কিন্তু পরে দেখা গেল যে দোকানদার তাহাকে ঠকাইয়া দ্বিগুণ মূল্য আদায় করিয়া লইয়াছে। যাহা হউক, এই দোকানদারের মারফৎ রামপ্রসাদ নূতন পুরাতন অনেকগুলি বন্দুক, রিভলবার ও পিস্তল সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই অস্ত্র সংগ্রহ করিতে যাইয়া রামপ্রসাদকে দুইএকবার খুব বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। দেশীয় রাজ্যেও গোয়েন্দার অভাব নাই। কয়েকজন অপরিচিত যুবককে অস্ত্রব্যবসায়ীর দোকানে বার বার আনাগোনা করিতে দেখিয়া জনৈক টিকৃটিকির সন্দেহ হয়। একদিন সে ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া জানিতে পারে যে, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। তখন ইহাদিগকে ধরিবার জন্য সে এক ফন্দী ঠিক করে। লোকে যেমন টোপ ফেলিয়া মাছ শীকার করে এই টিকটিকিটিও তেমনি ইহাদের জন্য এক টোপ ফেলিল। সে বলিল যে, সে ইহাদিগকে কয়েকটী ভাল বন্দুক সংগ্রহ করিয়া দিবে। রামপ্রসাদ ও তাহার সঙ্গিগণ সরল বিশ্বাসে ইহার অনুগমন করিলেন। টিকটিকিটি ইহাদিগকে যেখানে লইয়া গেল সেটি একটি পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টরের বাড়ী। ভাগ্যক্রমে ইন্‌স্‌পেক্টরসাহেব তখন গৃহে উপস্থিত ছিলেন না। টিকটিকিটি ইহাদিগকে বাহিরে বসাইয়া রাখিয়া ভিতরে সংবাদ দিতে চলিয়া গেল। দ্বারে একজন পুলিশ প্রহরী মোতায়েন ছিল। তাহার পুলিশের সাজ দেখিয়া রামপ্রসাদের সন্দেহ হইল। দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করাতেই রামপ্রসাদ বুঝিয়া ফেলিলেন যে তাহারা সাধ করিয়া পুলিশের জালে পড়িয়াছেন। বন্ধুবর তখনও ভিতর হইতে ফিরিয়া আসেন নাই, এই অবসরে রামপ্রসাদ তাহার দলবল লইয়া সরিয়া পড়িলেন। ভাগ্যে দেশীয় রাজ্যের গোয়েন্দা তেমন বুদ্ধিমান নহে, তাই রামপ্রসাদ ও তাহার সঙ্গিগণ সে যাত্রায় বাঁচিয়া গেলেন।

আর একবারের কথা। সেবার ইহাদের অবস্থা আরও সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল। রামপ্রসাদের অসীম সাহস, অপরিসীম তাহার কর্তব্যনিষ্ঠা। সংবাদ পাওয়া গেল যে, একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেট একটি রাইফেল বিক্রয় করিবেন। সাহসে ভর করিয়া রামপ্রসাদ

তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া উহা ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অভিজ্ঞ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সাহেবের সন্দেহ হইল; তিনি বলিলেন যে, স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট হইতে এই মর্মে একটি সার্টিফিকেট লইয়া আইস যে, তিনি তোমাদিগকে জানেন। রামপ্রসাদ এইবার এক অসম সাহসিক কাজ করিয়া ফেলিলেন। নিজেই উক্তরূপ একটি সার্টিফিকেট লিখিয়া, নিজের হাতেই তাহাতে দারোগার নাম স্বাক্ষর করিয়া পরদিন রামপ্রসাদ ভদ্রলোকের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভদ্রলোকের সন্দেহ কমিল না, তিনি বলিলেন থানায় জিজ্ঞাসা না করিয়া তিনি তাহাদের নিকট রাইফেল বিক্রয় করিবেন না। তিনি আরও বলিলেন যে, রামপ্রসাদকে তাহাদের সঙ্গে থানায় যাইতে হইবে। এইবার রামপ্রসাদ প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে যে উপস্থিত-বুদ্ধি তাহাকে ইহা অপেক্ষাও অধিক বিপদের মধ্যে রক্ষা করিয়াছে, সেই উপস্থিতবুদ্ধির ফলেই তিনি এ যাত্রাও রক্ষা পাইয়া গেলেন। মুহূর্ত মাত্র ইতস্তত না করিয়া রামপ্রসাদ দৃঢ়স্বরে বলিলেন—যেন তিনি আপনাকে কতই অপমানিত জ্ঞান করিয়াছেন—"আপনি যদি আমাকে বিশ্বাসই না করতে পারেন, তাহলে আপনার সঙ্গে আমি কোন্ প্রকার সম্বন্ধ রাখতে চাই নে।" তারপর আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনি সঙ্গিগণকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

সেই দিন অপরাহ্নেই তাহারা ঠিক করিলেন যে, অতঃপর আর গোয়ালিয়র রাজ্যে থাকা নিরাপদ নহে। যে কয়টি অস্ত্র সংগ্রহ হইয়াছে তাহা লইয়াই শাহজাহানপুরে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

স্বতন্ত্র সত্তাকে বিস্মৃত হইয়া ব্যষ্টিকে একান্তভাবে সমূহের মধ্যে মিলাইয়া দেওয়াই সংঘজীবনের গোড়ার কথা। কোনও সংঘবিশেষের সভ্য যখন এই মূলনীতিটিকে ভুলিয়া সংঘকে আত্মপ্রাধান্যলাভের

সোপানবিশেষ বলিয়া মনে করে তখন তাহার নিজেরই কেবল নৈতিক অবনতি সংঘটিত হয় না, সংঘেরও বিপদ উপস্থিত হয়। ব্যক্তিবিশেষের আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্ধ আকাঙ্ক্ষা অনেক সময়েই বিপ্লব আন্দোলনের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে।

রামপ্রসাদের বিপ্লবদলেও এই পাপ প্রবেশ করিয়াছিল। মৈনপুরা নগরস্থ জনৈক সদস্য অল্পদিন বিপ্লবদলে থাকিয়াই 'নেতৃত্বরোগে' আক্রান্ত হয়! মূল দলের মধ্যে থাকিয়া গেলে অবিসম্বাদিত নেতা হওয়া যায় না। এই জন্য ঐ সদস্যটি স্বয়ং একটি স্বতন্ত্র দল গড়িয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হয়। অল্পসময়ের মধ্যে তাহার কয়েকটি সহচর ও অস্ত্রশস্ত্রও জুটিয়া গেল। রামপ্রসাদের দলে থাকিতে ডাকাতি করিবার সুবিধা হয় নাই, তাই স্বতন্ত্র দলের নেতা হইয়া এই সদস্যটি ডাকাতি করিবার সঙ্কল্প করিতে থাকে। অনেক পরীক্ষার ভিতর দিয়া মানুষকে যাচাই করিয়া না লইতে পারিলে তাহাকে বিপ্লবদলের কোন প্রয়োজনীয় কার্যের ভার দেওয়া অথবা কোনও গোপনীয় বিষয়ের সন্ধান প্রদান করা নিরাপদ নহে। স্বয়ং-নির্বাচিত এই নূতন নেতাটি এই সম্বন্ধে কোনই সতর্কতা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই। ফলে কয়েকটি নিতান্ত কাঁচা লোক তাহার দলে প্রবেশ করিয়া সমস্ত গুপ্ত তথ্যই জানিয়া লইয়াছিল। ইহাদেরই একজন সদস্যকে ডাকিয়া একদিন বলা হইল যে, তাহারই এক ধনী আত্মীয়ের গৃহে ডাকাতি করা হইবে। সদস্যটি রাজী হইল না দেখিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিবার ভয় প্রদর্শন করা হইল। এই নূতন সদস্যটি এত-কিছুর জন্য প্রস্তুত ছিল না, তাই নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সে পরদিনই পুলিশে যাইয়া সমস্ত সংবাদ বলিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে ধরপাকড় শুরু হইয়া গেল। তদন্তসূত্রে পুলিশ রামপ্রসাদ প্রভৃতিরও সন্ধান পাইল। একজনের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে দলকে-দল বিপন্ন

হইয়া পড়িল। একে একে সকলের নামেই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইল। ইহাই 'মৈনপুরী ষড়যন্ত্র মামলা' নামে খ্যাত।

পুলিশের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য রামপ্রসাদ তাঁহার কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে ফেরার হইয়া পড়িলেন। রামপ্রসাদ বিপ্লব আন্দোলনকে জীবনের ব্রত বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তাই ফেরার হইয়াও তিনি কর্ম পরিত্যাগ করিলেন না। সেবার দিল্লীতে কংগ্রেস হইবে। স্থির হইল কংগ্রেসে যাইয়া বাজেয়াপ্ত পুস্তকগুলির অবশিষ্ট কযেক সংখ্যা বিক্রয় করিয়া ফেলা হইবে। রামপ্রসাদ শাহজাহানপুর সেবা-সমিতির অ্যাম্বুল্যান্স বিভাগের সেবক হইয়া দিল্লীতে আসিলেন। সেবকদিগের সর্বত্র অবাধগতি, তাই এই কার্য করিতে করিতে তাহার পুস্তক বিক্রয়েরও যথেষ্ট সুবিধা হইল। বাজেয়াপ্ত পুস্তক কংগ্রেস-মণ্ডপে বিক্রীত হইতেছে, পুলিশের নিকট এ সংবাদ অবিদিত রহিল না। এই সুযোগে যদি বিপ্লব-বাদীদিগকে গ্রেপ্তার করা যায়, এই ভরসায় পুলিশ কংগ্রেস-মণ্ডপ ঘেরাও করিয়া ফেলিল। রামপ্রসাদ দেখিলেন মহাবিপদ। কিন্তু বিপদে বুদ্ধি-ভ্রংশ হওয়া রামপ্রসাদের কুষ্ঠিতে লেখা ছিল না। তাড়াতাড়ি অবিক্রিত পুস্তকগুলি সংগ্রহ করিয়া ওভারকোটের মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিলেন। তারপর সেটি কাঁধে ফেলিয়া এ্যাম্বুলেন্স খাটটি হাতে লইয়া সতর্ক পুলিশ প্রহরীর সম্মুখ দিয়া তিনি সটান বাহির হইয়া পড়িলেন। পুলিশ তাহাকে চিনিতে পারিল না, বাধাও দিলনা। পরে সমস্ত কংগ্রেস-মণ্ডপ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও একখানি বাজেয়াপ্ত পুস্তক পাওয়া গেল না। পুলিশকে ম্লানমুখে ফিরিয়া যাইতে হইল।

আর এক দিনের কথা। ফেরার আসামীর বিপদের সীমা নাই। রাজার আদেশে মাথাগুলির যাহাদের একটি মূল্য নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহারা কোথাও নিঃশঙ্কচিত্তে দুই দিন একাদিক্রমে বাস করিতে পারে

না। শাহজাহানপুরে ফিরিয়া আসিয়া রামপ্রসাদ দেখিতে পাইলেন যে, সেখানে তাঁহাদের জীবন নিরাপদ নহে। তাই সেখান হইতে আবার পালাইয়া নিকটবর্তী একটি ছোট সহরে ক্ষুদ্র একখানি বাড়ী ভাড়া লইয়া কিছুদিন বাস করিবার সঙ্কল্প করিলেন। পুলিশ দুইএক দিনের মধ্যেই জানিতে পারিল যে, পলাতক আসামীগণ ঐ সহরে আসিয়া আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছে। রামপ্রসাদও সংবাদ পাইলেন যে, তাহাদের ক্ষুদ্র বাড়ীখানার উপর পুলিশের দৃষ্টি পড়িয়াছে। সুতরাং আবার পালাইতে হইবে। এক অন্ধকার রাত্রি দেখিয়া সঙ্গিগণ সহ নিরুদ্দেশ পথের যাত্রীসব আবার পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। গভীর অন্ধকার ধরাতল ছাইয়া ফেলিয়াছে। রাজপথ জনশূন্য। রামপ্রসাদ তাহার সঙ্গিগণ সহ ত্বরিৎপদে সহর পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন। সহসা পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিয়া উঠিল, "কে যায়? দাঁড়াও"। তাঁহারা দাঁড়াইলেন না, যেমন চলিতেছিলেন তেমনই চলিতে লাগিলেন। আবার শব্দ হইল, "দাঁড়াও, নইলে গুলি করব।" আর পলায়ন করিবার চেষ্টা করা বৃথা মনে করিয়া রামপ্রসাদ দাঁড়াইলেন। যে ডাকিতেছিল সে কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারই হস্তস্থিত লণ্ঠনের আলোকে রামপ্রসাদ দেখিলেন যে, স্বয়ং দারোগা সাহেব। দারোগা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কে? কোথায় যাচ্ছ?" রামপ্রসাদ দেখিলেন দারোগা একা, প্রয়োজন হইলে তাহাকে হত্যা করিয়া আত্মরক্ষা করাও কঠিন হইবে না। কিন্তু বিনা রক্তপাতে যদি আত্মরক্ষা হয় তাহা হইলে রক্তপাত করিয়া লাভ কি? তাই বলিলেন, "আমরা ছাত্র, ষ্টেশনে যাচ্ছি।" "কোথায় যাবে?" দারোগা জিজ্ঞাসা করিল। রামপ্রসাদ উত্তর করিলেন, "লক্ষ্ণৌ"। দারোগা লণ্ঠন উঁচু করিয়া দুই একবার দেখিল, তারপর বলিল, "রাত্রে আলো নিয়ে চলা উচিত।

ভুল হয়ে গেছে, কিছু মনে করো না।" রামপ্রসাদ ও তাহার সঙ্গিগণ অনেক-কিছুই মনে করিতেছিলেন, বিশেষ করিয়া দারোগার মূর্খতার কথা। কিন্তু লম্বা সেলাম ঠুকিয়া মুখে বলিলেন, "সে কি কথা! আপনি আপনার কর্তব্য করেছেন, তাতে মনে করবার আর কি আছে?'

দারোগা চলিয়া গেল! রামপ্রসাদও অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ক্ষণ-কাল পরেই মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। জানুয়ারী মাস, উত্তর-ভারতের হাড়ভাঙা শীত। তাহার উপর বরফের মত ঠাণ্ডা বৃষ্টির জল গায়ে আসিয়া পড়িতেছে। শীতে কাঁপিতে কাঁপতে পথের ধারে একখানি ক্ষুদ্র আটচালায় আসিয়া সকলে আশ্রয় লইলেন। পাখী বা জানোয়ার আসিয়া যাহাতে ফসল নষ্ট করিতে না পারে তাহাই দেখিবার জন্য কোন কৃষক বোধ হয় মাঠের মধ্যে আটচালাখানি বাঁধিয়া রাখিয়া-ছিল। সে জীর্ণ আটচালা বৃষ্টির জল রোধ করিতে পারে না। তাহারই নীচে ভিজিয়া ভিজিয়া বড় কষ্টে তাহাদের রাত্রি কাটিয়া গেল।

রাত্রি প্রভাত হইলে রামপ্রসাদ সঙ্গিগণকে লইয়া শাহজাহানপুরে ফিরিয়া আসিলেন। তারপর বড় বন্দুকগুলি মাটীর নীচে পুঁতিয়া রাখিয়া সেই রাত্রিতেই দলবল সহ এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন। সঙ্গে সাথী তাহার তিন জন।

(৪)

সংসারে বিপ্লববাদীকে কতই না দুঃখদুর্দশা সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়। ইংরাজের কারাগার-দ্বার তাহার জন্য তো চিরদিনই মুক্ত হইয়া রহিয়াছে; দারিদ্র্যের যন্ত্রণা, প্রিয়জনের গঞ্জনা, সর্বোপরি নৈরাশ্যের তীব্র দংশন তাহার অন্তরপ্রদেশকে প্রতিনিয়তই ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত করিয়া তোলে। কিন্তু এ সকল সহ্য করা যায় যদি

সহকর্মিগণের প্রাণঢালা ভালবাসা ও একান্ত বিশ্বাসের অধিকারী হওয়া যায়। রামপ্রসাদ এতদিন সব সহিয়াও সহকর্মীদিগের বিশ্বাস ও ভালবাসাকে সম্বল করিয়া বাঁচিয়াছিলেন ; আজ অদৃষ্টের ক্রূর পরিহাসে সেই বন্ধুগণও তাহাকে ছাড়িয়া গেল ! কেবল তাহাই নহে, ইহাদের নিকট তিনি যে ব্যবহার পাইলেন তাহাতে তাহার হৃদয় ভাঙিয়া গেল।

কিছুদিন পূর্বে সামান্য একটি ঘটনা লইয়া জনৈক বন্ধুর সহিত একটু মতান্তর হইয়াছিল। অনেকক্ষণ বাদানুবাদের পর আপোষে মীমাংসাও হইয়া গিয়াছিল। রামপ্রসাদ মনে করিতেছিলেন সমস্তই মিটিয়া গিয়াছে। কিন্তু বন্ধুটি তাহার সে কলহের কথা ভুলিতে পারে নাই, বরং অন্য দুইটি সঙ্গীর মনেও রামপ্রসাদের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ বিষের সঞ্চার করিয়া তুলিয়াছিল। আজ প্রয়াগে আসিয়া উহা অপ্রত্যাশিতরূপে আত্মপ্রকাশ করিল।

রামপ্রসাদ সঙ্গিগণ সহ ধর্মশালায় বাসা লইয়াছিলেন। সেদিন কথায় কথায় তাহার বন্ধুটি বলিয়া উঠিল, "আমাদের মধ্যে একজন অতি দুর্বলচিত্ত লোক। দলের মঙ্গলের জন্য তাকে মেরে ফেলতে হবে।" রামপ্রসাদ ইহাতে আপত্তি করিলেন। হত্যাই যদি করিতে হয় তাহা হইলে একজন সঙ্গীকে হত্যা করিবে কেন ? আমরা বিপ্লবী, যাহারা আমাদিগকে শিয়াল-কুকুরের মত তাড়াইয়া ফিরিতেছে, হত্যা করিতে হইলে তাহাদেরই একজনকে হত্যা করিব। এই প্রস্তাব সঙ্গীদের মনঃপূত হইল না। তাহারা রামপ্রসাদের উপর অধিকতর বিরক্ত হইয়া উঠিল।

সমস্তদিন নানাস্থানে ঘুরিয়া সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে চার বন্ধু গঙ্গাতীরে গিয়া উপবেশন করিল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন সবেমাত্র নিবিড় হইয়া উঠিতেছে। রামপ্রসাদের ভাবপ্রবণ হৃদয় ভগবানের প্রতি ভক্তিতে গলিয়া

গেল। নয়ন মুদিয়া তিনি উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সঙ্গী তিনজন পাশে বসিয়া তাহার গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছিল।

হঠাৎ খট্ করিয়া পিস্তলের ঘোড়া টিপিবার শব্দ হইল, তারপর গুড়ুম শব্দে সমস্ত গঙ্গাতীর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। রামপ্রসাদ স্পষ্ট অনুভব করিলেন তাহার কানের পাশ দিয়া শাঁ করিয়া একটি গুলি চলিয়া গেল। চোখ মেলিয়া চাহিতেই দেখিতে পাইলেন যে, তাহার একজন সঙ্গী তাহারই দিকে পিস্তল লক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয়বার গুলি ছুড়িবার চেষ্টা করিতেছে। ভাল করিয়া সমস্ত অবস্থা বুঝিয়া উঠিবার পূর্বেই দ্বিতীয়বারও গুলি চলিল। এবারও লক্ষ্য ব্যর্থ হইল। রামপ্রসাদ তখন কটীদেশ হইতে স্বীয় পিস্তল টানিয়া বাহির করিলেন, কিন্তু খাপ হইতে উহা খুলিবার পূর্বেই তৃতীয়বার গুলি চলিল। যাহা হউক গোরখপুরে মৃত্যু তাঁহার জন্য অনেক মোহনীয় মূর্তিতে অপেক্ষা করিতেছিল। তৃতীয় গুলিও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইল না। বার বার তিনবার লক্ষ্য ব্যর্থ হইতে দেখিয়া তাঁহার সঙ্গী আর চতুর্থবার গুলি করিবার ভরসা পাইল না। রামপ্রসাদেরও চক্ষু প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সে ভয়ঙ্কর মূর্তির দিকে চাহিয়া, বিশেষ করিয়া তাঁহার অব্যর্থলক্ষ্য হাতে পিস্তল দেখিয়া তাহার সঙ্গিগণ ভীত হইল। রামপ্রসাদ গুলি করিবার পূর্বেই ত্বরিৎপদে তাহারা অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

রামপ্রসাদের আর গুলি ছোড়া হইল না। মাথার ভিতরে তখন তাহার আগুন জ্বলিতেছিল। হায়রে! শেষে পরম বন্ধুও এমন করিয়া বিশ্বাসঘাতক হইয়া দাঁড়াইবে। রামপ্রসাদ দুই চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল আর কিসের আশায় সংসারে বাঁচিয়া থাকিবে। যাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া জীবনের সমস্ত সুখ-সম্ভোগের

মূলে কুঠারাঘাত করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছি তাহারাও যদি শেষে এমন করিয়া সরিয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে কি আশ্রয় করিয়া সংসারে বাঁচিয়া থাকিব? না, এ সংসার বাঁচিয়া থাকিবার জায়গা নহে, আমি সন্ন্যাসী হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিব।

পরমুহূর্তেই আবার তাহার মনে হইল—না, এই ভয়ঙ্কর বিশ্বাস-ঘাতকতার প্রতিশোধ লইতে হইবে। যাহারা বন্ধুর ললাট লক্ষ্য করিয়া অবিচলিতচিত্তে বন্দুক ছুড়িতে পারে, তাহাদের অসাধ্য কাজ সংসারে কিছুই নাই। তাহারা সমাজের শত্রু, তাহারা দেশের শত্রু, তাহারা সমস্ত মানবতার শত্রু। তাহাদের নিধন সাধন করিয়া ধরণীর ভার-মোচন করিতে হইবে।

মনের এইরূপ অবস্থা লইয়া রামপ্রসাদ শাহজাহানপুরে জননীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। মনে তাঁহার শান্তি নাই, আহার-নিদ্রা ছাড়িয়া দিবানিশি তিনি উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে গৃহকোণে পড়িয়া থাকিতেন। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া মায়ের চক্ষু সজল হইয়া উঠিত—জীবনের সঙ্কল্প যাহার এমন মহান, তাহার জীবন কিনা এমনভাবে ব্যর্থ হইয়া যাইবে!

একদিন রামপ্রসাদ আর আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া সমস্ত কথা মায়ের চরণে নিবেদন করিলেন। সমস্ত শুনিয়া স্নেহকরুণ কণ্ঠে মা বলিলেন, "হৃদয়ে এমন প্রতিহিংসার আগুন নিয়ে তুমি দেশের কাজ করতে পারবে না, রামপ্রসাদ। পরাধীন দেশে দেশসেবা করতে যেয়ে সঙ্গীদের কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা পুরস্কার পেয়েছ—সে ত নিতান্তই স্বাভাবিক। তাতে এমন করে মুসড়ে পড়লে চলবে কেন? নৈরাশ্য সহ্য করার শক্তি যদি না থাকে তবে বিপ্লবের পথে চলা তোমার চলবে না।"

রামপ্রসাদ আবেগকম্পিতকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "আমি এর প্রতি-হিংসা না নিয়ে ছাড়ব না, মা। আমি বিশ্বাসঘাতকদের হত্যা না ক'রে নিশ্চিন্ত হবনা।

জননী স্নেহমিশ্রিত ভৎর্সনার স্বরে বলিলেন, "না, রামপ্রসাদ। দেশের কাজ করতে চাও তো তোমাকে এ বিদ্বেষ ছাড়তে হবে। দেশে তুমি একটি বিপ্লব ঘটাতে যাচ্ছ, তাতে এর চাইতেও অনেক বড় বিশ্বাস-ঘাতকের সঙ্গে তোমার বোঝাপড়া করতে হবে। তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, আজ থেকে আর তুমি ওদের অমঙ্গল চিন্তা করবে না।"

রামপ্রসাদ বলিলেন, "আমি যে পূর্বেই প্রতিজ্ঞা করেছি, মা, ওদের হত্যা না করে আমি নিশ্চিন্ত হব না।"

মা বলিলেন, "সে প্রতিজ্ঞা তোমাকে উল্টাতে হবে। আমি মাতৃ-ঋণের বদলে তোমার কাছে এইটুকু চাচ্ছি। দিবে না?"

রামপ্রসাদ আর না বলিতে পারিলেন না। মায়ের চরণ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "তোমার কথা আমি ঠেলতে পারব না, মা। তবে আমায় আশীর্বাদ কর, আমি যেন এ প্রতিজ্ঞা রাখতে সমর্থ হই!"

জননীর দুই চক্ষু স্নেহবাষ্পে সজল হইয়া উঠিল। মাতৃহৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে সেদিন যে সকরুণ প্রার্থনা উঠিয়াছিল তাহা বিধাতার আসন না টলাইয়া নিবৃত্ত হয় নাই। রামপ্রসাদ পরদিন জাগিয়া উঠিয়া বুঝিতে পারিলেন মায়ের আশীর্বাদ সফল হইয়াছে, তিনি হৃদয়ে শান্তি পাইয়াছেন।

(৫)

মায়ের আদেশেই অতঃপর রামপ্রসাদ গোয়ালিয়র রাজ্যে অজ্ঞাতবাস করিতে চলিয়া গেলেন। ফেরার আসামী তিনি, সহরে বাস করিবার জো নাই; তাই সহর হইতে অনেক দূরে এক অতি ক্ষুদ্র গ্রামে যাইয়া কৃষিকার্য আরম্ভ করিলেন।

সে কি দুঃখের দিন! গোয়ালিয়রের ঊষর ভূমিতে সোনা ফলাইতে হইলে অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। রাম-

প্রসাদকে রৌদ্রবৃষ্টি তুচ্ছ করিয়া দিনের পর দিন মাঠে কাজ করিতে হইত। কোনও প্রকারে দিন গুজরান তো করিতে হইবে। দুই একজন সহকর্মী তখন পর্যন্ত রামপ্রসাদের মুখের দিকে চাহিয়া পড়িয়াছিল। নিজের পেটে পুরিবার মত কিছু থাকুক আর না থাকুক, ইহাদিগকে দুই বেলা দুই মুঠা খাবার ও পরিধানের বস্ত্র দিতে হইবে। রামপ্রসাদ নিজের যাহা-কিছু ছিল একে একে বিক্রয় করিয়া ইহাদিগকে ও আপনাকে কোন প্রকারে বাঁচাইয়া রাখিতে লাগিলেন। রৌদ্রবৃষ্টিতে দিবানিশি অক্লান্ত কায়িক পরিশ্রম করিয়া শরীর তাহার ভাঙিয়া পড়িল, বর্ণ কালো হইয়া উঠিল। হঠাৎ দেখিলে কেহ তাহাকে চিনিয়া উঠিতে পারিত না।

বিপদের উপর বিপদ! মার কাছে যাহা কিছু ছিল এতদিন তিনি তাহা নিঃশেষ করিয়াছিলেন, এইবার পিতার যথাসর্বস্বের উপর টান পড়িল। যুক্ত-প্রদেশের আইন অনুসারে পিতা বর্তমানেই পুত্র সম্পত্তির অধিকারী হয়। ফেরার আসামী রামপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করিতে না পারিয়া সরকার তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার নোটিশ দিলেন। গতিক ভাল নয় দেখিয়া পিতা সমস্ত সম্পত্তি নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করিয়া গোয়ালিয়র চলিয়া গেলেন। যাহা কিছু অর্থ হাতে আসিয়াছিল, দুইটি কন্যার বিবাহ দিতেই তাহা সব ফুরাইয়া গেল। সহায়হীন রামপ্রসাদ চাহিয়া দেখিলেন যে, তাহারই অপরাধে পিতা তাহার পথের ভিখারী হইলেন।

কৃষিকার্য করিয়া আর খরচ চলে না দেখিয়া রামপ্রসাদ একবার ব্যবসায় করিবার সংকল্প করিলেন। বাল্যে তাঁহার এক বাঙালী বন্ধু ছিল, নাম সুশীলকুমার সেন। এই বন্ধুর নির্বন্ধাতিশয্যেই তিনি ধূমপান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প কিছু দিন পরেই এই বন্ধুটির মৃত্যু

হয়। ইহারই স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে রামপ্রসাদ বাংলাভাষা শিখিয়াছিলেন। আজ দুর্দিনে রামপ্রসাদ বাংলা পুস্তক হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া আপনার আয় বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইলেন। রামপ্রসাদকে মধ্যাহ্নে মাঠে পশু চরাইতে হইত। অনেক সময়েই কেবল বসিয়া থাকা ছাড়া অন্য কোনপ্রকার কাজ থাকিত না। এই নিস্তব্ধ কর্মহীন মধ্যাহ্নগুলিকে তিনি প্রয়োজনীয় কাজে লাগাইবার চেষ্টা পাইলেন। সঙ্গে কাগজ পেন্সিল থাকিত। কখনও বা গাছের ছায়ায় বসিয়া, কখনও বা কোন সাধুর আশ্রমে বসিয়া "নিহিলিষ্ট রহস্য" নামক বাংলা পুস্তকের অনুবাদ করিতেন। অনুবাদ সমাপ্ত হইলে "সুশীল সিরিজ" নাম দিয়া ঐ গ্রন্থ প্রকাশ করা হইল। কিছুদিন পর রামপ্রসাদ আরও একখানি পুস্তক লিখিয়া ছাপাইলেন। পুস্তক প্রকাশিত হইল বটে কিন্তু বাজারে কাটতি হইল না। বরং এই চেষ্টায় তাহার পাঁচশত টাকা ক্ষতি হইল। দারিদ্র্য ঘুচাইতে গিয়া রামপ্রসাদ দারিদ্র্য বৃদ্ধি করিলেন।

কিন্তু দুঃখের দিনেরও অবসান হয়। রামপ্রসাদেরও দুঃখের দিনের অবসান হইল। যুদ্ধশেষে রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা সমস্ত রাজনৈতিক কয়েদীর মুক্তি দান করা হইল। যুক্ত-প্রদেশের সরকারও রামপ্রসাদের নামের মকদ্দমা তুলিয়া লইলেন। বহুদিন পর আবার তিনি স্বাধীন ভাবে শাহজাহানপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

(৬)

রামপ্রসাদ মুক্তি পাইলেন বটে কিন্তু পুলিশ তাহার সঙ্গ ছাড়িল না। বৃটিশ ভারতে পুলিশের কৃপাদৃষ্টি একবার যাহার উপর পড়িয়াছে তাহার আর ইহাদের সস্নেহ মনোযোগ হইতে মুক্তি পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। আইনের চক্ষে নির্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও টিকটিকিদের

চক্ষে চিরদিন তাহাকে দোষী হইয়া থাকিতে হইবে, সম্রাটের করুণা কণায় সিঞ্চিত হইলেও পুলিশ প্রহরীর অগ্নিবর্ষ জলন্ত দৃষ্টি নিশিদিন তাহাকে জ্বালাইয়া মারিবার জন্য পশ্চাদনুসরণ করিতে বিরত হইবে না। স্বাধীন জীবনের আনন্দ আস্বাদন হইতে চিরদিন তাহাকে বঞ্চিত হইয়া থাকিতে হইবে। কি সে দুর্বিষহ যন্ত্রণা! নিশিদিন পুলিশ প্রহরী ছায়ার মত যাহার অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছে সে জীবনে সোয়াস্তি পাইবে কেমন করিয়া? সকলের সঙ্গে অবাধভাবে চলাফেরা করিবার তাহার উপায় নাই, প্রাণ খুলিয়া দুটি কথা বলিবারও তাহার সাধ্য নাই, কে জানে অনুসরণকারী গুপ্তচর কি কদর্থ করিয়া প্রভুদের কানে তাহা পঁহুছাইয়া দিবে।

শাহজাহানপুরে পুলিশের গুপ্তচর রামপ্রসাদের তথাকথিত মুক্ত জীবনকে দিনের পর দিন দুর্বিষহ করিয়া তুলিতে লাগিল। কেহ তাহার সঙ্গে কথা কহিতে সাহস করিত না, বন্ধুগণও ভয়ে মুখ ফিরাইয়া লইত, পাছে তাহার সঙ্গে মেলামেশা করিলে তাহারাও পুলিশের সন্দেহভাজন হইয়া পড়ে। নিজ বাসভূমে পরবাসী হইয়া রামপ্রসাদের সঙ্গীহীন জীবন ক্রমেই তাহার নিকট অসহ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

বিপদের উপর বিপদ। দারিদ্র্য ক্রমেই তাহাকে অনাহারের সীমা-রেখার দিকে টানিয়া আনিতেছিল। কিন্তু উপায় কি? পুলিশের খাতায় যাহার নাম লিখা রহিয়াছে তাহাকে কাজ দিবে কে? স্বাধীনতার একনিষ্ঠ পূজারী রামপ্রসাদ কাহারও নিকট নিজ জীবনধারণের জন্য অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করিতে লজ্জিত ও সংকুচিত হইতেন। এমন কি পিতার নিকট হইতে অর্থ-সাহায্য লইতেও তিনি স্বীকৃত হন নাই। তাঁহার কেবলই মনে হইত যে, আমারই জন্য পিতার আমার সর্বস্ব গিয়াছে; আবার কোন মুখে তাঁহার নিকট অর্থ প্রার্থনা করিব? উপায়ান্তর না

দেখিয়া তিনি বস্ত্রবয়ন কার্য শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পর এক বন্ধুর সহায়তায় তাহার একটি চাকুরীও জুটিয়া গিয়াছিল। দুঃসময়ে এইচাকুরীটুকু পাইয়া রামপ্রসাদের অনেক সুবিধা হইয়াছিল বটে কিন্তু অধিকদিন তিনি চাকুরীজীবনের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারেন নাই।

এই সময়ে রামপ্রসাদ কিছুদিন সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। তাঁহার সাহিত্য সাধনার প্রথম ফল নিহিলিষ্ট-রহস্যের অনুবাদ তেমন ভাল হয় নাই, বাজারেও তাহার তেমন কাট্‌তি হয় নাই। কিন্তু এই পুস্তকখানি লিখিয়া তাহার লিখিবার একটু হাত আসিয়াছিল। শাহজাহানপুরে ফিরিয়া তিনি 'ক্যথারিণ' নামক আর একখানি পুস্তক লিখেন। বাজারে এই পুস্তকখানির বেশ একটু আদর হয়। উৎসাহিত হইয়া রামপ্রসাদ তখন 'স্বদেশী রঙ্গ' নামক আর একখানি পুস্তক লিখেন। শ্রীঅরবিন্দের 'যৌগিক সাধন' নামক পুস্তকখানিও তিনি হিন্দীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সত্য নামে ও ছদ্মনামে বিভিন্ন মাসিক ও সাপ্তাহিক কাগজেও তাহার নানাবিধ লেখা প্রকাশিত হয়। বস্তুত পরবর্তীকালে রামপ্রসাদ সুলেখক বলিয়াই খ্যাতি অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বিপ্লবীর চলিবার পথ নিরাপদ নহে। এ পথে স্থানে স্থানে যেমন কাঁটা আছে তেমন গুপ্ত গর্তেরও অভাব নাই। বিপ্লবীর মুখোশ পরিয়া স্বকীয় স্বার্থ সাধন উদ্দেশ্যে অনেকেই এ পথে আসিয়া থাকে। সাধারণ গুণ্ডাদের সঙ্গে মূলত ইহাদের কোনই পার্থক্য নাই। কেবল পার্থক্য এই যে, সাধারণ পেশাদার গুণ্ডা অপরের অনিষ্ট সাধন করে বটে, ভাব-প্রবণ তরুণবয়স্ক যুবকের সর্বনাশ করে না বা করিতে পারে না। কিন্তু যাহারা বিপ্লবীর মুখোশ পরিয়া আপনাদের স্বার্থসাধন চেষ্টায় ব্রতী হয় তাহারা অনেক হতভাগ্য যুবকেরই সর্বনাশ সাধন করিয়া থাকে।

এই শ্রেণীর দুইএকজন লোক রামপ্রসাদের মত খাঁটি সচ্চরিত্র বিপ্লবীকে শিখণ্ডীর মত সম্মুখে রাখিয়া আপনাদের স্বার্থ সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু সফলকাম হইতে পারে নাই। ইহাদেরই একজন এক বার রামপ্রসাদকে এক দল বিপ্লবীর পরিচালন-ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করে। রামপ্রসাদ প্রথমে স্বীকৃতও হইয়াছিলেন কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এই দলের নেতৃস্থানীয় দুইএকজনের :মধ্যে স্বার্থবিরোধ সংঘটিত হয় এবং ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ দলের প্রায় সকলেই ধরা পড়ে। ইহাদের মধ্যে অনেক নির্দোষ তরুণ স্বদেশপ্রেমিকও ছিল। রামপ্রসাদ সৌভাগ্যক্রমে বাঁচিয়া যান।

আর এক বারের কথা। একদিন তাঁহার জনৈক বিপ্লবী বন্ধু আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি এমন একজন লোকের সন্ধান পাইয়াছেন যিনি জাল নোট প্রস্তুত করিতে সিদ্ধহস্ত। অর্থের অভাব মিটাইবার জন্য রামপ্রসাদ জাল নোট প্রস্তুত করাইতে স্বীকৃত হইলেন। যিনি নোট প্রস্তুত করিবেন তিনি প্রাথমিক খরচস্বরূপ কিছু অর্থও আদায় করিয়া লইলেন। কিন্তু উক্ত মহাপুরুষের নোট-প্রস্তুতপ্রণালী পরিদর্শন করিয়া রামপ্রসাদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, সে জুয়াচোর ভিন্ন আর কিছুই নহে। মানুষের নিকট হইতে নকল তুলিয়া লইবার অছিলায় বেশী দামের নোট লইয়া সরিয়া পড়াই তাহার ব্যবসায়। এইরূপ কাজে হাত দিয়া প্রবঞ্চিত হইলে পুলিশে যাইবার সাহস কাহারও হয় না, কাজেই ইহাদের জুয়াচুরিও ধরা পড়ে না। কিন্তু রামপ্রসাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির নিকট এই জুয়াচোরপুঙ্গবেরও জুয়াচুরি চলে নাই। ধরা পড়িয়া অবশেষে সে রামপ্রসাদের নিকট সমস্ত কথা খুলিয়া বলে। রামপ্রসাদও তাহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করাইতে বাধ্য করেন এবং ললাটের উপর রিভলভার ধরিয়া প্রতিজ্ঞা করান যে, সে ভবিষ্যতে আর এরূপ কার্যে অগ্রসর হইবে না।

আর একবার আরেক ভদ্রলোক আসিয়া রামপ্রসাদকে পুনরায় এক বিপ্লবদল সংগঠন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। এই দলের নিয়ম-কানুন কেমন হইবে তাহার এক খসড়া তিনি পূর্ব হইতেই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিপ্লব দলের প্রত্যেক কর্মীই সমিতির ভাণ্ডার হইতে অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইবে। রামপ্রসাদ এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন দেশ-সেবা চাকুরী নহে, লাভজনক ব্যবসা তো নহেই। দেশ সেবা ত্যাগ ভিন্ন অপর কোন ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। জীবনের যথাসর্বস্ব পণ করিয়া যে বিপ্লবদলে যোগদান করিবে সে সমিতির নিকট হইতে অর্থ সাহায্য লইবে কেমন করিয়া? রামপ্রসাদের এইরূপ মনোভাব দেখিয়া উক্ত ভদ্রলোক সরিয়া পড়েন। অতঃপর তাহাকে আর বিপ্লব আন্দোলন সম্পর্কে কোন কাজ করিতে দেখা যায় নাই।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া রামপ্রসাদ ক্রমেই সমস্ত জিনিসটির উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিতে থাকেন। দারিদ্র্যে যন্ত্রণা তো লাগিয়াই আছে তাহার উপর প্রতিনিয়ত দেশ-সেবার নামে এমন মিথ্যা ও ব্যভিচার দেখিয়া তিনি কিছুদিন বিপ্লবসম্পর্কীয় সমস্ত কাজ ছাড়িয়া দিয়া অর্থ উপার্জনের দিকে মনঃসংযোগ করেন। চাকুরী করিয়া অর্থাভাব ঘুচাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই দেখিয়া রামপ্রসাদ ব্যবসায় করিবার সংকল্প করিলেন। বস্ত্রবয়ন কার্য তিনি পূর্বেই কিছু কিছু শিক্ষা করিয়া-ছিলেন, তাই ব্যবসায় করিতে যাইয়া বস্ত্রব্যবসায়ের দিকেই তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। রামপ্রসাদ রেশমের বস্ত্রবয়ন কার্য আরম্ভ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ব্যবসায়ে তাহার বেশ লাভও দেখা দিল, এমন কি, তিনি কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতেও সমর্থ হইলেন। ছোট ভগ্নীর বিবাহ দেওয়া বাকী ছিল। রামপ্রসাদ স্বোপার্জিত অর্থে ভাল ঘরে তাহার বিবাহ দিলেন। অবস্থার পরিবর্তনে আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের মনো-

ভাবেরও পরিবর্তন দেখা দিল। এমন-কি, দুইএক স্থান হইতে বিবাহের সম্বন্ধও আসিতে লাগিল। রামপ্রসাদ কিন্তু বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। একে তো অর্থাগম সম্বন্ধে তেমন কোন নিশ্চয়তা নাই, তার উপর জীবনের একটা মহান উদ্দেশ্য রহিয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় বিবাহ করিয়া জীবনের দায়িত্ব বৃদ্ধি করিবার প্রবৃত্তি তাহার হইল না।

রামপ্রসাদের এইরূপ যখন অবস্থা তখন উত্তর-ভারতীয় বিপ্লবদলকে পুনরায় সংগঠন করিবার একটা ঐকান্তিক চেষ্টা আরম্ভ হইল। যাঁহারা এই সংগঠন-কার্যে ব্রতী ছিলেন তাহারা রামপ্রসাদকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মায়ের এ আহ্বানে তিনি সাড়া না দিয়া থাকিতে পারিলেন না।

(৭)

অসহযোগ আন্দোলনের গতিবেগ তখন মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। দেশ জুড়িয়া একটা অবসাদের ভাব। এত পরিশ্রম, এত অর্থব্যয়, এত আত্মত্যাগ করিয়া যে সংগঠনকে প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া তোলা হইয়াছিল সেই সংগঠন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর এক ইঙ্গিতে আর ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কর্মের তড়িৎপ্রবাহ খেলিয়া যায় না। পরাজয়ের গ্লানি মাথায় করিয়া একটা যুদ্ধ-ক্লান্ত জাতি যেন অঘোরে ঘুমাইতেছে। আর কে তাহাকে জাগাইয়া তুলিবে? যুদ্ধের দামামা শুনিয়া যে সমস্ত তরুণ প্রাণ উৎসাহে বিদ্যালয় ছাড়িয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া সমবেত হইয়াছিল তাহারা যুদ্ধ স্থগিত হওয়ায় আবার বিদ্যালয়ে ফিরিয়া গিয়াছে। আইন-ব্যবসায়ী যাহারা মাসিক নির্দিষ্ট ভাতার আশায় অসহযোগ করিয়া নেতৃত্ব কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন তাহারা ভাতা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আদালতে ফিরিয়া গিয়াছেন। যাহারা ইতিপূর্বে সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া বৃটিশশক্তির বিরুদ্ধে স্বরাজসৈন্য

পরিচালনা করিতেছিলেন তাহারা কাউন্সিল-এ্যাসেম্‌ব্লির আরাম-কেদারায় যুদ্ধক্লান্ত দেহকে বিশ্রাম করাইতেছিলেন। উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে খাঁটি কর্মিগণও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অসহযোগ আন্দোলনের পুরোহিত defeated and humbled হইয়া সবরমতী আশ্রমে চরকা সম্বলে ব্রহ্মচর্য ও অহিংসামন্ত্রের মাহাত্ম্য প্রচারে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। দেশ জুড়িয়া জড়তা, আর কে এ জড়তা ভাঙ্গিয়া জাতিকে জাগাইয়া তুলিবে?

কর্মক্ষেত্র হইতে একে একে সকলকেই সরিয়া যাইতে দেখিয়া বিপ্লববাদিগণই পুনরায় জাতিকে জাগাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সংকল্প করিলেন। অসহযোগ আন্দোলনকে কোন দিনই তাহারা পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। নৈতিক বলের প্রভাবের নিকট পশুবল যে আপনা হইতেই মাথা নোয়াইবে একথা তাহাদের বিশ্বাস হয় নাই, বৃটিশসিংহ হিংসা ছাড়িয়া বেদান্ত শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইবে এই অসম্ভব ব্যাপার সত্য বলিয়া কল্পনা করিবার প্রবৃত্তিও তাহাদের কোন দিনই হয় নাই। তথাপি তাহারা মহাত্মা গান্ধীকে নেতৃত্বে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, এমন-কি অনেকেই আপ্রাণ শক্তিতে অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্যের জন্যও চেষ্টা করিতেছিলেন। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল যে, একটা নূতন কর্মপদ্ধতি একটিবার পরীক্ষা করিয়াই দেখা যাক না কেন কি হয়। কিন্তু সেই পরীক্ষায় যখন কোনই ফল হইল না তখন তাঁহারা আর দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, কর্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়া দেশকে পুনরায় সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাই রামপ্রসাদের আবার ডাক পড়িল।

এবার বিপ্লববাদিগণ এক সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতিতে চলিবার সংকল্প করিলেন। বিপ্লবদলের কেন্দ্রীয় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল, প্রত্যেক প্রদেশে

প্রাদেশিক কার্যকরী সমিতি স্থাপন করিয়া বিভিন্ন সভ্যকে বিভিন্ন দায়িত্ব-পূর্ণ কার্যে নিযুক্ত করা হইল। যুক্তপ্রদেশের নেতৃত্বভার রামপ্রসাদের উপরেই ছাড়িয়া দেওয়া হইল, তবে কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির সভ্যগণ তাহারা কার্যাবলী পরিদর্শন করিতেন এবং সকল প্রকার উপদেশ প্রদান করিতেন।

অনেকেরই ধারণা যে বিপ্লববাদিগণ তরলমতি যুবকমাত্র। তাহাদের কোন গঠনমূলক প্রতিভা নাই, ক্ষণিক উত্তেজনাবশে যাহা-কিছু একটা করিয়া ফেলা ভিন্ন অপর কোন শক্তিই তাহাদের নাই। কিন্তু বিপ্লবদলের কর্মপদ্ধতি আলোচনা করিলে তাহারা দেখিতে পাইবেন যে বিপ্লববাদিগণ কেবল যে সুশৃঙ্খল সংঘবদ্ধভাবে কর্ম করিতে পারে তাহাই নহে, ভারতের ভবিষ্যৎ, তথা কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধেও তাহাদের বেশ সুস্পষ্ট ধারণা আছে। রামপ্রসাদ এইবার যে দলে প্রবেশ করিলেন তাহা কয়েকজন উগ্রভাবা-পন্ন যুবকমাত্রের সমাবেশ ছিল না, তাহা ভারতে এক সশস্ত্র বিপ্লব সৃষ্টি করিবার জন্য নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা ও পদ্ধতির সহিত কর্ম করিতেছিল। সুশৃঙ্খল ও সশস্ত্র বিপ্লবদ্বারা ভারতে গণতন্ত্রমূলক এক যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই ইহাদের লক্ষ্য। এই রাষ্ট্রের শাসনপ্রণালী ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষ কর্তৃক প্রণীত হইবে না, সমস্ত ভারতের প্রতিনিধিদিগের মত লইয়াই ইহার প্রণয়ন করা হইবে। সর্বপ্রকার অন্যায় উৎপীড়ন ও অবিচারের উচ্ছেদ সাধন করিয়া সাম্যের ভিত্তির উপরেই এই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পদ্ধতির মূলনীতি স্থাপন করা হইবে।

ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের প্রতিনিধি লইয়া সংগঠিত এক কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির উপর এই দলের শাসন ও সংগঠন ভার ন্যস্ত ছিল। সর্বসম্মতিক্রমে না হইলে কেন্দ্রীয় সমিতি কোন কিছু সম্বন্ধেই সিদ্ধান্ত করিতে পারিত না এবং কেন্দ্রীয় সমিতি একবার কোন সিদ্ধান্তে উপনীত

হইলে দলের অপর কাহারও তাহার প্রতিবাদ করিবার অধিকার ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কার্যাবলী পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ করা এবং বিভিন্ন প্রদেশের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করাই কেন্দ্রীয় সমিতির মুখ্য কার্য ছিল। এতদ্ভিন্ন ভারতে বিপ্লবপ্রসঙ্গে বহির্ভারতের যাহা কিছু কাজ হইত তাহার সমস্ত দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সমিতির উপরেই ন্যস্ত ছিল।

প্রত্যেক প্রদেশে বিপ্লবকার্য নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য এক এক প্রাদেশিক কার্যকরী সমিতি ছিল। প্রাদেশিক কার্যকরী সমিতির কর্মপ্রচেষ্টা নিম্ন-লিখিত পাঁচটি বিভাগে নিয়ন্ত্রিত হইত:—(১) লোক সংগ্রহ, (২) অর্থ সংগ্রহ ও terrorism করা (৩) অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ (৪) প্রচার ও (৫) বৈদেশিক সংস্রব। প্রকাশ্য ও গুপ্ত ছাপাখানার সাহায্যে লোকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করিয়া, সাধারণভাবে সভা-সমিতি করিয়া ও কথকতা ও ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে প্রচারকার্য পরিচালনা করা হইত। লোক-সংগ্রহের জন্য প্রত্যেক জিলায় দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সংগঠন-কর্তা নিযুক্ত করা হইত। সাধারণত লোকের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দান হইতেই সমিতির আর্থিক সংকুলান হইত, তবে অর্থাভাব হইলে এবং নিতান্ত প্রয়োজন বোধ করিলে ডাকাতি করিয়াও অর্থসংগ্রহের বিধান ছিল। সরকারের দমননীতি চণ্ডরূপ ধারণ করিলে পুলিশ-কর্মচারীদিগকে হত্যা করিয়া সরকারকে ভীতি প্রদর্শন ও দেশবাসীর মনে বিশ্বাস জন্মাইবারও চেষ্টা করা হইত। সমিতির প্রত্যেক সভ্যকেই অস্ত্রশিক্ষা দেওয়া হইত এবং প্রত্যেককেই যাহাতে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করা যায় তাহার জন্যও চেষ্টা হইত। তবে প্রাদেশিক কার্যকরী সমিতির সভ্য অথবা জিলার ভারপ্রাপ্ত সংগঠন-কর্তার অনুমতি ভিন্ন কেহই অস্ত্র নিজের সঙ্গে রাখিতে পারিত না অথবা ব্যবহার করিতে পাইত না।

বিশেষ গুণসম্পন্ন না হইলে এবং অনেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে

কাহাকেও জিলার সংগঠন-কর্তা নিযুক্ত করা হইত না। জিলার ভার-প্রাপ্ত কর্মসেবকের নিজ এলাকাস্থিত সর্বপ্রকার আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিতে হইত, যাহাতে তিনি বিভিন্নপ্রকার লোকের সংস্রবে আসিতে পারেন এবং দলের জন্য উপযুক্ত সভ্য সংগ্রহ করিতে পারেন। এই সমস্ত কর্মচারিগণ যথাসম্ভব পরস্পর পরস্পরকে জানিতে পারিতেন না এবং তাহারা যে সমস্ত সভ্য সংগ্রহ করিতেন যথাসম্ভব তাহাদিগকে পরস্পর হইতে পৃথক রাখিবার চেষ্টা করা হইত। কোন সভ্যই উর্ধ্বতন কর্মচারীকে না জানাইয়া নিজ নিজ কেন্দ্র পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না।

এই দল প্রকাশ্য ও গুপ্ত উভয় উপায়েই বিপ্লববাদ প্রচারের চেষ্টা করিত। প্রকাশ্যভাবে এই সমিতির সভ্যগণ ক্লাব, লাইব্রেরী, সেবা-সমিতি, ব্যায়ামশালা প্রভৃতি জনহিতকর অনুষ্ঠান স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেন। এইরূপ অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া অধিকসংখ্যক যুবকের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। সেই জন্যই এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছিল। কুলী-মজুরদের সংগঠনকার্যে যোগদান করা ইহাদের অবশ্যকর্তব্য কার্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কেননা বিপ্লব আরম্ভ হইলে কারখানার শ্রমিক ও কুলীদের নিকট হইতে অনেক প্রকার সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। সম্ভব হইলে দেশী ভাষায় সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া এবং নানা-প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়া গণতন্ত্রমূলক যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে জনসাধারণকে শিক্ষিত করা ইহাদের অপর এক অত্যাবশ্যকীয় কর্ম বলিয়া বিবেচনা করা হইত। গুপ্তভাবে করিবার জন্যও ইহাদের নানাপ্রকার কর্মতালিকা নির্দিষ্ট ছিল। গুপ্ত প্রেস স্থাপন করিয়া প্রকাশ্যভাবে যে সমস্ত পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভব নহে, তাহা ছাপাইবার বন্দোবস্ত করা এবং তাহাদের প্রচার করা এক অতি প্রয়োজনীয় কর্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। উপযুক্ত

লোককে বিদেশে পাঠাইয়া যুদ্ধবিদ্যা এবং অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করা শিক্ষা করাইবারও যথাসম্ভব চেষ্টা হইত। সমিতির সভ্যগণ যাহাতে ইউ-নিভারসিটী কোর এবং সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে তাহার জন্যও সভ্যদিগকে যথেষ্ট উৎসাহিত করা হইত। এতদ্ভিন্ন কংগ্রেসের অর্থ ও প্রতিপত্তি যাহাতে বিপ্লবকার্যের জন্য ব্যবহার করা যায় এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত কর্মীদিগকে কংগ্রেসের দায়িত্বপূর্ণ পদগুলি অধিকার করিবার জন্য সাহায্য করা হইত।

সভ্য সম্বন্ধেও খুব কড়াকড়ি নিয়মের ব্যবস্থা ছিল। উপযুক্ত গুণ না থাকিলে কেবল সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য কাহাকেও গুপ্ত-সমিতিতে গ্রহণ করা হইত না। সমিতির নিয়ম পালন করিতে কোন প্রকার অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে সে সভ্যকে মারিয়া ফেলিবার বিধান ছিল। তবে প্রাদেশিক কার্যকরী সমিতির অনুমতি ভিন্ন কোন সভ্যকেই দণ্ড দেওয়া হইত না।

প্রত্যেক জিলার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে নিম্নলিখিত বারটি বিষয় সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইত।

(১) জিলায় কতজন সহযোগী আছে, তাহাদের প্রকৃত রাজনৈতিক মত কি? বিপ্লব আন্দোলনের প্রতি তাহাদের মনোভাব কিরূপ।

(২) জিলার লোক সংখ্যা কত? জিলায় কতটি গ্রাম আছে? প্রত্যেক গ্রামের লোক:সংখ্যা কত? প্রত্যেক গ্রামে কোন্ কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান আছে? গ্রামের ধনী লোকদের বিবরণ। পথ, রেলপথ, ষ্টেশন, নদী, রেলওয়ে সেতু, সাধারণ সেতু ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের অবস্থিতি ও সংখ্যা নির্দেশ করিয়া প্রত্যেক গ্রামের এক একটি মানচিত্র ,অঙ্কিত করিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক থানায় কতজন কনেষ্টবল আছে? তাহাদের মধ্যে

কতজন সশস্ত্র ও কতজন সাধারণ ? প্রত্যেক থানায় কি পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আছে এবং তাহা কোথায় রাখা হয় ?

(৪) জিলায় কোনও সৈন্যদল আছে কি না ? থাকিলে সৈন্যসংখ্যা কত ? তাহাদের মধ্যে কতজন ভারতবাসী ও কতজন শ্বেতাঙ্গ ? তাহাদের নিকট কি পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আছে এবং তাহা কোথায় রাখা হয় ? ভারতীয় সৈন্যদের পৈত্রিক আবাসভূমি কোথায় ?

(৫) পুলিশের গুপ্তচর ও সংবাদদাতাদের নাম ও ঠিকানা।

(৬) গ্রামবাসীদের কাহার কাহার নিকট অস্ত্রশস্ত্র আছে ? সেই সমস্ত অস্ত্রের বর্ণনা। জিলার কোনও স্থানে অস্ত্রশস্ত্রের দোকান আছে কি না ? থাকিলে এ সমস্ত দোকান সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইবে।

(৭) জিলায় কতটি জনহিতকর সভাসমিতি আছে ? উহাদের প্রত্যেকের সভ্যসংখ্যা কত ? ঐ সমস্ত সভা-সমিতির প্রধান প্রধান কর্মকর্তাদিগের নাম। তাহাদের রাজনৈতিক মনোভাব কিরূপ ?

(৮) জিলায় স্কুল-কলেজের সংখ্যা কত ? তাহাদের প্রত্যেকের ছাত্রসংখ্যাই বা কত ? বিদ্যালয় বলিতে সকল শ্রেণীর বিদ্যালয়ই বুঝিতে হইবে।

(৯) জিলায় কতগুলি কারখানা আছে ? কোন্ কোন্ কারখানায় কোন্ কোন্ দ্রব্য প্রস্তুত হয় ? প্রত্যেক কারখানায় মজুরের সংখ্যা কত ? কারখানার বাহিরেও শ্রমজীবী আছে কি না ? থাকিলে তাহাদের সংখ্যা ও ব্যবসায়।

(১০) পোষ্ট আফিস, টেলিগ্রাফ আফিস এবং ব্যাঙ্কের সংখ্যা। এইরূপ প্রত্যেক আপিসে কতজন কর্মচারী আছে। কর্মচারীদিগের নাম ও ঠিকানা।

(১১) মোটরকার, নৌকা, গরুর গাড়ী ও অন্যান্য যানের সংখ্যা ও বর্ণনা। এই সমস্ত যানের মালিকদের নাম ও ঠিকানা।

(১২) সরকারী কর্মচারীদিগের সংখ্যা, নাম ও ঠিকানা। ইয়োরোপীয় কর্মচারীদিগের নাম ও ঠিকানা এবং তাহাদের গৃহের অবস্থিতি।

এই কর্মপদ্ধতি আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে আপনাদের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও পন্থা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট একটা ধারণা না লইয়া বিপ্লববাদিগণ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন নাই।

যাহা হউক ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পুনর্সংগঠন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য কানপুরে বিপ্লববাদীদিগের এক গুপ্ত-সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় স্থির হয় যে, কাজের সুবিধার জন্য সমস্ত যুক্তপ্রদেশকে সাতটি বিভাগে বিভক্ত করা হইবে, যথা, কাশী, ঝান্সী, কানপুর, আলিগড়, মীরাট, শাহজাহানপুর এবং ফৈজাবাদ। কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে ইহাই স্থির হয় যে, গুপ্ত পুলিশ কর্মচারীদিগের কার্যে বাধা প্রদান করিতে হইবে, কংগ্রেসের যে সমস্ত কাজ গুপ্ত-সমিতির কার্যপ্রণালীর ক্ষতিকর তাহার সমালোচনা করিতে হইবে এবং প্রকাশ্য ও গুপ্তভাবে বৈপ্লবিক-ভাব প্রচার করিতে হইবে। প্রচার, অর্থ ও অস্ত্রসংগ্রহ কার্যে অধিক মনোযোগ প্রদান করিবার জন্য জিলার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিদিগকে আদেশ প্রদান করা হয়। এই সময় বিপ্লবদলের সভ্যসংখ্যা প্রায় একশতের কাছাকাছি হইয়াছিল।

স্বয়ং বিচারপতির ভাষায় রামপ্রসাদ "was one of the most methodical and zealous member of it." কর্মভার গ্রহণ করিয়াই তিনি সর্বান্তঃকরণে কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আসফাক উল্লা খাঁ ছিলেন তাহার প্রধান সহকর্মী। রামপ্রসাদ বিশেষ করিয়া শাহজাহানপুরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন; তবে প্রাদেশিক কার্যকরী সমিতির সভ্য

হিসাবে তাঁহাকে অনেক সময়েই যুক্ত-প্রদেশের অন্যান্য স্থানে গমন করিয়া সেই সব স্থানের কার্যাবলী পরিদর্শন করিতে হইত। এমন-কি একবার তাহার কলিকাতা যাওয়াও স্থির হইয়াছিল। পুলিশ পথিমধ্যে তাহার চিঠি আটকাইয়া ফেলায় তিনি উপযুক্ত সময়ে সংবাদ পাইতে পারেন নাই এবং সেইজন্যই তাহার কলিকাতা যাওয়াও হয় নাই।

যাহা হউক লোক, অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ ব্যাপারে রামপ্রসাদ যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। সমিতির নির্দেশ অনুযায়ী শাহজাহানপুরে তিনি 'প্রতাপদল' নামক এক যুবকসঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছিলেন। একই সঙ্ঘের ভিতর দিয়া বিপ্লববাদমূলক সাহিত্যের সাহায্যে তিনি স্থানীয় তরুণদিগের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করিতেন। স্থানীয় হাইস্কুলের ছাত্র শ্রীইন্দুভূষণ মিত্র এই সমস্ত কার্যে, বিশেষ করিয়া প্রতাপদলের সংগঠন বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বলিতে কি, রামপ্রসাদের সমস্ত গুপ্ত চিঠিপত্র ইন্দুর মারফতেই তাহার নিকট উপস্থিত হইত। রামপ্রসাদ ইন্দুকে বড়ই ভালবাসিতেন ও বিশ্বাস করিতেন কিন্তু অদৃষ্টের এমনই নিষ্ঠুর পরিহাস যে এই ইন্দুই পরে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দেয় এবং রাজসাক্ষী সাজিয়া নিজের জীবন রক্ষা করে।

যাহা হউক, লোক-সংগ্রহ-কার্য নিয়মিত ও সুশৃঙ্খলভাবেই চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু অর্থ-সমস্যা অতি অল্পদিনের মধ্যেই অত্যন্ত ভীষণ আকার ধারণ করিল। অনেকেই সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া বিপ্লবদলে যোগদান করিয়াছিল। অর্থের অভাবে তাহাদের দুর্দশা চরমে উপস্থিত হইল। রামপ্রসাদ নিজের নামে ধার করিয়া কিছুদিন চালাইলেন। কিন্তু আয়ের যেখানে কোনও নির্দিষ্ট পন্থা নাই সেখানে ধার করিয়া কতদিন চলিতে পারে? যাহারা প্রথম প্রথম ধার দিয়াছিলেন তাহারা প্রদত্ত অর্থ ফিরিয়া পাইবার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই দেখিয়া ভবিষ্যতে ধার

দেওয়া বন্ধ করিলেন। দুঃসময় দেখিয়া বন্ধুগণও হাত গুটাইলেন। যাহারা রামপ্রসাদকে অর্থ-সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন তাহাদের নিকট বার বার যাতায়াত করিয়াও প্রতিশ্রুত অর্থ পাওয়া গেল না। অর্থের অভাবে অনেক কেন্দ্রের কাজই প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। যাহারা সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, আয়ের যাহাদের কোনই পন্থা নাই, তাহাদিগকে যদি দুইবেলা দুই মুঠা খাইতেও না দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহারা কেমন করিয়া কাজ করিবে? রামপ্রসাদ শত চেষ্টা করিয়াও যখন অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেন না, তখন দুইএকজন কর্মী হতাশ হইয়া কর্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া গেল। রামপ্রসাদ চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

এই সময়ে দুইএকজন সদস্য পরামর্শ দিলেন যে, অর্থ থাকিতেও যাহারা দেশের কাজের জন্য অর্থ প্রদান করিতে স্বীকৃত নয় তাহাদের অর্থ জোর করিয়া কাড়িয়া লইলে কোনইঅধর্ম হয় না। ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি অপহরণ করা রামপ্রসাদ কোন দিনই পছন্দ করিতেন না। এক্ষেত্রেও যে তিনি সম্মত হন নাই তাহার প্রমাণও আমাদের আছে। ফাঁসীর দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী রামপ্রসাদের মিথ্যা বলিয়া কোনই লাভ থাকিতে পারে না। কারাগারে বসিয়া রামপ্রসাদ যে আত্মজীবনী লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সমস্ত প্রকার ডাকাতির কথা অস্বীকার করিয়াছেন। তথাপি আদালতে প্রমাণ হইয়াছিল যে, রামপ্রসাদ ট্রেন-ডাকাতি ছাড়াও একাধিক ডাকাতির নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। ইংরাজের আদালতে কেমন করিয়া সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করা হইয়া থাকে তাহা ভারতবাসীমাত্রই জানেন। তথাপি কেহ যদি আদালত কর্তৃক স্বীকৃত সত্যের (?) প্রতিবাদ করেন তবে তাহাকে আদালত অবমাননার জন্য জবাবদিহি করিতে হয়। রামপ্রসাদ অন্যান্য

ডাকাইতিতে যোগদান করিয়াছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে আমরা এখানে কেবলমাত্র ইহাই বলিতে চাই যে মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখী দাঁড়াইয়া রামপ্রসাদ ট্রেণ ডাকাতির কথা নির্বিকল্প চিত্তে স্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু অন্যান্য ডাকাতির কথা করেন নাই। দুইটি ডাকাতির কথা স্বীকার করিলে রামপ্রসাদকে দুইবার ফাঁসী যাইতে হইত না। সুতরাং আদালতের স্বীকৃত সত্যই সত্য, না সর্বত্যাগী রামপ্রসাদের মুখের কথাই সত্য তাহা পাঠক স্বয়ংই বিচার করিবেন।

রামপ্রসাদ তাঁহার পরামর্শদাতাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, যদি লুণ্ঠনই করিতে হয় তাহা হইলে সরকারী অর্থই লুণ্ঠন করা হউক। ভারতবাসী বৃটিশ সরকারের ন্যায্য অধিকারের দাবী স্বীকার করে না; সুতরাং প্রজার নিকট হইতে কর আদায় করিবারও তাহাদের কোন অধিকার নাই; সাধারণের প্রদত্ত অর্থ সাধারণের কাজের জন্য লুঠিয়া লওয়ায় কোনরূপ অন্যায় নাই। রামপ্রসাদের এই যুক্তির গুরুত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারেন নাই এবং কেমন করিয়া কবে কোথায় সরকারী অর্থ লুণ্ঠন করিতে হইবে নির্ণয় করিবার ভার রামপ্রসাদের উপরই অর্পিত হইয়াছিল।

একদিন রামপ্রসাদ ট্রেণে যাইতে যাইতে দেখিলেন যে, ষ্টেশনমাষ্টার গার্ডের গাড়ীতে এক থলি টাকা আনিয়া রাখিল। তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন যে, ঐ গাড়ীতে একটি লোহার সিন্দুক থাকে এবং সেই সিন্দুকেই ঐ সমস্ত অর্থ রক্ষিত হয়। রামপ্রসাদ স্থির করিলেন যে, পথের মাঝে কোথাও গাড়ী দাঁড় করাইয়া গার্ডের কামরা হইতে টাকা লুঠিয়া লওয়া হইবে।

কেমন করিয়া এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হইয়াছিল তাহা আমরা ইতিপূর্বেই বর্ণনা করিয়াছি। কেবলমাত্র দশজন লোক লইয়াই রামপ্রসাদ এই অসমসাহসিক কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং স্বীয় গভীর বুদ্ধি,

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ক্ষিপ্রতার বলে এই অভূতপূর্ব ঘটনায় অসম্ভবরূপ সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। নরহত্যা করা রামপ্রসাদের মোটেই অভিপ্রায় ছিল না, কিন্তু তথাপি দৈবদুর্বিপাকে এই সময়ে নরহত্যা হইয়াছিল। রামপ্রসাদ এই দুর্ঘটনার জন্য পরে অনেক অনুশোচনা করিয়াছেন। ইংরাজের আদালত এই নরহত্যার দায়ে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছে। ভগবানের আদালতে সাক্ষী-সাবুদ গৃহীত হয় না। অন্তর্যামী মানুষের অন্তরের ভাবকেই সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য সাক্ষী বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। জানি না তাঁহার আদালতে রামপ্রসাদকে এই নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত হইতে হইবে কি না।

ট্রেণ ডাকাতির অস্বাভাবিকত্ব গুপ্ত-পুলিশের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। নিশ্চয়ই ইহার সঙ্গে কোন রাজনৈতিক সংস্রব আছে, ইহা মনে করিয়া গুপ্ত-পুলিশের বিশেষবিভাগ এই ডাকাতির তদন্তভার গ্রহণ করে এবং মিঃ হর্টনের নির্দেশানুযায়ী তদন্তকার্য পরিচালিত হয়। ঘটনার অব্যবহিত পরেই মিঃ হর্টন লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হন এবং সমস্ত সংবাদ অবগত হইলে তাহার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয় যে, এই ডাকাতি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র সংশ্লিষ্ট না হইয়া পারে না। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি সংবাদ পাইলেন যে, শাহজাহানপুরে অপহৃত নোটের কয়েকখানি পাওয়া গিয়াছে। ইহার ফলে শাহজাহানপুরের political suspectদের প্রতি গুপ্ত-পুলিশের দৃষ্টি পতিত হয় এবং পুলিশ বিশেষ করিয়া রাম-প্রসাদের গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে থাকে। রামপ্রসাদকে ইন্দুভূষণের সহিত এত বেশী মেলামেশা করিতে দেখিয়া পুলিশ ইন্দুর উপরেও নজর রাখে এবং ইহারই ফলে তাহারা জানিতে পারে যে অন্যান্য বিপ্লবীদের নিকট হইতে রামপ্রসাদ ইন্দুর মারফতেই সমস্ত চিঠিপত্র পাইয়া থাকে। পুলিশ তখন ইন্দুর চিঠি চুরি করিতে আরম্ভ করে। এই সমস্ত চিঠিপত্র

হইতে পুলিশ যুক্তপ্রদেশের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র সম্পর্কে প্রায় সমস্ত সংবাদই জানিতে পারে। তাহারা আরও জানিতে পারে যে, অবিলম্বেই মীরাট সহরে বিপ্লববাদীদিগের এক গুপ্ত সভার অধিবেশন হইবে। গুপ্ত পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্টর রায় বাহাদুর জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি গুপ্তভাবে এই সভাসংক্রান্ত সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিতে প্রেরিত হয়। বলিতে কি, জিতেন্দ্রবাবুর তদন্তের ফল এই মোকদ্দমায় পুলিশের খুব প্রয়োজনে আসিয়াছিল। পুলিশ কর্মচারীদিগের মত এই যে, ইহারই প্রতিশোধ লইবার বাসনায় ১৯২৭ সালের শেষভাগে কাশীতে রায় বাহাদুরের উপর গুলি চলিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে তিনি মরেন নাই এবং দেওঘর ষড়-যন্ত্র মোকদ্দমায় সরকারের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়া আরও অনেক যুবককে জেলে পাঠাইবার সহায়তা করিয়াছেন।

যাহা হউক সমস্ত চিঠিপত্র হইতে পুলিশ আরও জানিতে পারে যে বোমা প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিবার জন্য রামপ্রসাদের কলিকাতা যাইবার কথা ছিল। যথাসময়ে এই সম্বন্ধে শেষ আদেশ রামপ্রসাদ জানিতে পারেন নাই বলিয়াই তাহার পরিবর্তে রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী কলিকাতা গিয়াছিলেন এবং সেখানে দক্ষিণেশ্বর ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে ধৃত হইয়া আদালতে দোষী সাব্যস্তও হইয়াছিলেন। যাহা হউক, এই সমস্ত চিঠি হইতে পুলিশ নাকি আরও জানিতে পারে যে এই বিপ্লবদল শীঘ্রই আর একটি ডাকাতি করিবার সংকল্প করিয়াছেন। সুতরাং শান্তি-প্রিয় রাজভক্ত প্রজার ধনপ্রাণ রক্ষা করিবার জন্য পুলিশের উপদেশে যুক্তপ্রদেশের সরকার বহুসংখ্যক বিপ্লববাদীকে এই সঙ্গে গ্রেপ্তার করিবার অনুমতি প্রদান করেন।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর। অনেকদিন হইতেই রামপ্রসাদ গুজব শুনিতেছিলেন যে, তাহাকে ট্রেণ ডাকাতি এবং ষড়যন্ত্রের দায়ে

গ্রেপ্তার করা হইবে। পুলিশ যে দিবানিশি তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে এ সংবাদও তাহার অজ্ঞাত ছিল না। ভয় কাহাকে বলে রামপ্রসাদ তাহা জানিতেন না। গ্রেপ্তার করিলেও পুলিশ যে তেমন প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহ করিতে পারিবে না এ ধারণা তাহার ছিল। তাই ২৫শে রাত্রিতে গুপ্ত-পুলিশের জনৈক কর্মচারীকে তাহার গৃহ পর্যন্ত অনুসরণ করিতে দেখিয়াও রামপ্রসাদের সুনিদ্রার কোন ব্যাঘাত হয় নাই।

অন্যান্য দিনের মত সেদিন ও রামপ্রসাদ সকাল ৪টার সময় গাত্রো-থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতে যাইতেছিলেন, বাহিরে অনেক লোকের আনাগোনার শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। দোর খুলিয়াই তিনি দেখিতে পাইলেন পুলিশ আসিয়াছে। তাহার বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। রামপ্রসাদ পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন, কাজেই তিনি বিস্মিত হইলেন না, ভয় তো তিনি জানিতেনই না। ওয়ারেণ্ট দেখাইয়া পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিল, তাঁহার গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া খানাতল্লাসীও করা হইল। অন্য কোন স্থান হইতে বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না। কিন্তু তাহার পরিহিত জামার পকেটে কয়েকখানি লিখিত চিঠি ছিল তাহা পুলিশের হস্তগত হইল। রামপ্রসাদ পূর্বদিন চিঠি কয়খানি লিখিয়াছিলেন, ডাক চলিয়া যাওয়ায় সেদিন আর তাহা ডাকে দেওয়া হয় নাই। সামান্য বিলম্ব এবং ততোধিক সামান্য ভুলের জন্য কয়েকখানি জীবন্ত প্রমাণ পুলিশের হস্তগত হইল।

পুলিশ রামপ্রসাদের প্রতি কোনরূপ অভদ্র ব্যবহার করিল না, এমন কি গ্রেপ্তারের সময় তাহাকে হাতকড়িও পরান হয় নাই। দিবালোক সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ হইবার পূর্বেই পুলিশের গাড়ীতে রামপ্রসাদকে হাজতে লইয়া যাওয়া হইল।

দিবা অবসানের পূর্বেই রামপ্রসাদ জানিতে পারিলেন যে, তৃতীয় ব্যক্তির যে সমস্ত সংবাদ পাইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না পুলিশ সে সমস্ত সংবাদও কেমন করিয়া যেন হস্তগত করিয়াছে। রামপ্রসাদ বুঝিতে পারিলেন যে, সরকারের সংগঠনের তুলনায় বিপ্লববাদীদিগের সংগঠন কিছুই নহে।

রামপ্রসাদের সুদীর্ঘ কারাজীবন সুখেদুঃখে একপ্রকার কাটিয়া যাইতেছিল। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে কারাযন্ত্রণায় তাঁহাকে মুখ কুঞ্চিত করিতে দেখা যায় নাই। রামপ্রসাদের আধ্যাত্মিক জীবন উন্নত ছিল, তাই শারীরিক ক্লেশ তাঁহাকে কোন দিনই অভিভূত করিতে পারে নাই। বরং কারাজীবনের নির্জনতা তাঁহার চিত্তের একাগ্রতা বৃদ্ধি করিতেই সহায়তা করিয়াছিল। রামপ্রসাদ স্বভাবতঃই অপেক্ষাকৃত গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। তাই অন্যান্য সকলের সঙ্গে মিলিয়া হাসি ঠাট্টা করিতে তাঁহাকে বড় একটা দেখা যাইত না। অধিকাংশ সময়েই তিনি নির্জনে ভগবৎচিন্তায় কালাতিপাত করিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া সঙ্গীদের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি তিনি উদাসীন ছিলেন না। তাঁহার পরামর্শে বন্দিগণ দুইবার অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারই দৃঢ়তার আদর্শ অন্যান্য সকলের প্রাণে শক্তি ও সাহসের সঞ্চার করিত। অনশন ক্লেশে প্রায় সকলেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু রামপ্রসাদের প্রশান্ত মুখভাব কাতরতার ছায়ায় কোনদিনই ম্লান হইতে দেখা যায় নাই। একাদিক্রমে পনর দিন তিনি জলমাত্র পান করিয়াও সাধারণ লোকের মতই সমস্ত কাজকর্ম করিয়া যাইতেন। ষোড়শ দিনে তাঁহাকে

জোর করিয়া নলের সাহায্যে দুধ পান করান হয়। বস্তুত রামপ্রসাদ এইরূপ দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতে না পারিলে হয় তো বা অন্যান্য সকলেও শেষ পর্যন্ত টিকিয়া থাকিতে পারিতেন না।

কিন্তু আপনার শারীরিক ক্লেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হইলেও সহ-কর্মীদের বিশ্বাসঘাতকতা বা দুর্বলতা দেখিয়া রামপ্রসাদ অভিভূত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। দুর্বলতা মানুষ মাত্রেরই থাকে এবং সামান্য সামান্য বিষয়ে দুর্বলতা দেখাইলেই মানুষকে শাস্তিপ্রদান করা সমর্থনযোগ্য নহে। কিন্তু যে দুর্বলতার ফলে অপর অনেকের সর্বনাশ সাধিত হয়, সেরূপ দুর্বলতা বাস্তবিকই ক্ষমার যোগ্য নহে। রামপ্রসাদের সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই এইরূপ অমার্জনীয় দুর্বলতা দেখাইয়াছিলেন। যাহারা প্রকাশ্যভাবে সরকারী সাক্ষী সাজিয়াছিল তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্যান্য অভিযুক্তদের মধ্যে দুইএকজন অসাবধানতা বশতই হউক বা দুর্ব-লতা বশতই হউক, এমন-সব কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন যাহার ফলে সরকার পক্ষীয় মামলা অনেক সহজ হইয়া পড়িয়াছিল। রামপ্রসাদ মৃত্যুর পূর্বে অনেক দুঃখ করিয়া গিয়াছেন যে, বিপ্লব দলে লোক লইবার সময় তেমন কোন সাবধানতাই অবলম্বন করা হয় না। বিপ্লব প্রচার-কার্য একটি আর্ট; এই কার্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে প্রত্যেককে নিয়মিত শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। রামপ্রসাদ অনেক দুঃখ করিয়া গিয়াছেন যে, এই শিক্ষাদান কার্যের উপযুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা নিতান্তই কম এবং এই শিক্ষাদানের প্রণালী সম্বন্ধে তেমন কোন ভাল বই বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় না। তিনি তাহার আত্মজীবনীতে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দানের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে এবং উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিলে পুলিশের চক্ষে ধূলা দেওয়া তেমন কিছু কঠিন কাজ নহে। রামপ্রসাদ

তাহার সঙ্গীদিগের এইরূপ দুর্বলতা এবং অসাবধানতা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন।

রামপ্রসাদের আপনভোলা আত্মসমর্পণ প্রবৃত্তি তাঁহাকে সর্বপ্রকার সুখদুঃখ জ্ঞানের বহু উর্ধ্বে লইয়া গিয়াছিল। সুখ তাঁহাকে কর্তব্য ভুলাইয়াঁ দিতে পারিত না, দুঃখ তাঁহাকে অধিকতর সবল ও অধিকতর আত্ম-নির্ভরশীল করিয়া তুলিত। তাই মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা শুনিয়াও তাহার অন্তর বিচলিত হয় নাই। ফাঁসির দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীদিগকে সাধারণত অন্যান্য শ্রেণীর আসামী হইতে পৃথক করিয়া রাখা হয়। ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণদান করিবার পূর্বেই তাহাদিগকে জীবন্ত জগৎ হইতে পৃথক করিয়া মৃত্যুর স্তব্ধ নির্জনতার মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয়। রাম-প্রসাদের বেলায়ও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। দায়রা আদালতের দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে তিনি আপীল করিয়াছিলেন, কিন্তু শুনানীর দিন ধার্য হইয়াছিল সাড়ে তিন মাস পর। এই সুদীর্ঘকাল তাঁহাকে গোরখপুর জেলে অন্যান্য কয়েদী হইতে পৃথক করিয়া এক নির্জন গৃহে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে ৯ ফুট দীর্ঘ ও ৯ ফুট চওড়া এক ক্ষুদ্র কক্ষ, নিকটে কোথাও ছায়ার চিহ্নমাত্র নাই। গ্রীষ্মকাল, যুক্ত-প্রদেশের নির্দয় সূর্য সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রখর কিরণজালে তাঁহাকে পোড়াইয়া মারিত। উত্তপ্ত অগ্নিশিখা বহিয়া মধ্যাহ্নের দুরন্ত হাওয়া তাঁহার চারিদিক দিয়া সাঁ সাঁ করিয়া বহিয়া যাইত। নয়ন জুড়াইবার জন্য কোনদিকে সবুজের রেখাটুকুও নাই, কেবল প্রহরী আর জেলার ছাড়া অপর কোন মানুষের মুখ চোখে পড়ে না! চোখ মুদিলে ফাঁসিকাষ্ঠের মূর্তি মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। কিন্তু ইহার মধ্যেও রামপ্রসাদ সংযম হারাইয়া ফেলেন নাই। কৈশোর হইতেই তাঁহার বড় সাধ ছিল কোন জীবন্মুক্ত সাধুর শিষ্য হইয়া নির্জন গিরিগুহায়

ভগবদারাধনায় কাল কাটাইবেন। এই নির্জন কারাগৃহে তিনি তাঁহার সেই সযত্নপোষিত আকাঙ্ক্ষার চরম সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সাধুর আশ্রম মিলে নাই বটে, সাধনার আশ্রম তো মিলিয়াছে! রামপ্রসাদ এই নির্জন গৃহে দীর্ঘকাল ধরিয়া সত্যসত্যই যেন মৃত্যুর অমৃত আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জীবন ও মৃত্যুর পার্থক্য তাঁহার নিকট একাকার হইয়া মুছিয়া গিয়াছিল। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে বাহিরের রৌদ্রতপ্ত দিগন্তের পানে চাহিয়া চাহিয়া, অথবা গভীর নিশীথে স্বর্গমর্ত্ত্য একাকার করা নিবিড় ঘন অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিয়া রামপ্রসাদ যখন আপনার অবস্থার কথা চিন্তা করিতেন, তখনই এক অনির্ব্বচনীয় উপলব্ধির রসে তাহার অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিত। তিনি যেন বুঝিতে পারিতেন মৃত্যু ধ্বংস নহে, আত্মার রূপান্তর মাত্র।

কারাগারে আসিয়া রামপ্রসাদের রাজনৈতিক মতেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। এ মত পরিবর্ত্তন সুবিধাবাদীর মতপরিবর্ত্তন নহে, এ পরিবর্ত্তন গভীর বিশ্বাসসঞ্জাত। রামপ্রসাদ বিপ্লববাদের যৌক্তিকতায় বিশ্বাস হারান নাই, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় ঐ পথের কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন। তিনি ভারতবাসীর চরিত্রের স্বাভাবিক রক্ষণশীলতাটুকু স্পষ্ট করিয়াই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার স্বতঃই মনে হইয়াছিল, যাহারা দৈনন্দিন জীবনের নিতান্ত তুচ্ছ বিষয়েও গতানুগতিকতার অনুসরণ না করিয়া থাকিতে পারে না তাহারা কেমন করিয়া বিপ্লববাদীদিগের কার্য-কলাপ সমর্থন করিবে? দেশবাসীর অজ্ঞতা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন। বিপ্লববাদের মূল-নীতি সম্বন্ধে যাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাহারা কেমন করিয়া বিপ্লববাদীদিগের কার্য-কলাপ সমর্থন করিবে? ভারতবাসীর চক্ষে বিপ্লববাদী ডাকাত এবং নরহত্যাকারী ভিন্ন অপর কিছুই নহে। দেশবাসীর এই মনোবৃত্তি যত-

দিন পরিবর্তন না করা যায় ততদিন বিপ্লববাদের সাফল্যের আশা কোথায়? এই সমস্ত কথা ভাবিয়া রামপ্রসাদ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, গুপ্তভাবে বিপ্লবদল গঠন করিবার চেষ্টা করিবার পূর্বে জনসাধারণের মধ্যে খাঁটী বিপ্লববাদ প্রচার করিতে হইবে! সে কাজ সহরে বসিয়া করিলে চলিবে না। তাহার জন্য কর্মীদিগকে গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িতে হইবে। সাধারণ গ্রামবাসীদিগের সঙ্গে একান্তভাবে মিলিয়া মিশিয়া, তাহাদের সুখদুঃখের অংশীদার হইয়া তাহাদিগকে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। রামপ্রসাদ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দেশের বর্তমান অবস্থায় শিক্ষিত যুবকদিগকে বিপ্লববাদী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলে তাহারা একখানি বাজেয়াপ্ত পুস্তক বা একটি রিভলভারকেই বিপ্লবের প্রধান উপাদান বলিয়া মনে করিবে, একটি ডাকাতি বা একজন পুলিশ কর্মচারীকে হত্যা করাই এই শ্রেণীর বিপ্লববাদীদিগের জীবনের লক্ষ্য হইয়া উঠিবে। তাই মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে আত্মজীবনী লিখিতে যাইয়া রামপ্রসাদ আপনার ভুল মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন, তাই মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়াইয়া তিনি তাঁহার স্বজাতীয় যুবকদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, ভারতের জনসাধারণ যতদিন পর্যন্ত শিক্ষিত না হয় ততদিন ভুলেও যেন বিপ্লবদল সংগঠন করিবার চেষ্টা করিও না। যদি দেশসেবার প্রবৃত্তি থাকে, তবে প্রকাশ্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া দেশের সেবা করিবার চেষ্টা করিও। নতুবা তোমাদের ত্যাগ আশানুরূপ ফলপ্রসূ হইবে না। দেশের বর্তমান অবস্থা বিপ্লববাদের অনুকূল নহে, এ অবস্থায় বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা করিলে ব্যর্থ প্রয়াস হইয়া অকারণে প্রাণ বলিদান করিতে হইবে।

রামপ্রসাদের সৎসাহস ছিল। অন্তরের বিশ্বাস অনুযায়ী কার্য করিতে নিজের প্রতিপত্তি বা আর্থিক ক্ষতির কথা বিবেচনা করিয়া

কোন দিনই তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না। তাই মতপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সে কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারিয়াছিলেন। রাম-প্রসাদ প্রাণদণ্ড মকুব করিবার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। সে প্রার্থনা কাপুরুষের দয়া প্রার্থনা নহে, উহা বাঁচিয়া থাকিয়া দেশসেবা করিবার ঐকান্তিক বাসনাসঞ্জাত। অযোধ্যা চীফ কোর্টে যখন তাঁহার মামলা চলিতেছিল তখন তিনি নিজের সওয়াল-জবাব নিজেই লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ইহাতে তিনি মুক্তকণ্ঠে নিজের ভুল স্বীকার করিয়াছিলেন, এ প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন যে, মুক্তি পাইলে তিনি আর বিপ্লবদলে যোগদান করিবেন না, গঠনমূলক-কার্যের পথে স্বদেশসেবা করিবেন। বিচারক তাঁহার মুখের কথা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই: তাই তাঁহার অপরাধ ক্ষমাও করা হয় নাই। রামপ্রসাদ অবশ্য সে জন্য মোটেই দুঃখিত হন নাই। রাজবিদ্রোহীর প্রতি রাজসরকারের যে কোনই সহানুভূতি থাকে না এ সত্য রামপ্রসাদের অজ্ঞাত ছিল না। তথাপি রামপ্রসাদ কেন সর্ত দান করিয়া মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহার উত্তর তিনি নিজেই দিয়া গিয়াছেন। রাজবন্দীদের সম্বন্ধে সমস্ত প্রমাণ মজুত থাকিলেও তাহারা যদি ভবিষ্যতে বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখিবার প্রতিশ্রুতি দেয় তাহা হইলে তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করা হইবে। রামপ্রসাদ এই সরকারী উক্তির সত্যাসত্য প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং সত্য সত্যই তিনি দেশবাসীর চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, সরকার মুখে যাহা বলে, কার্যে তাহা করিতে তাহারা মোটেই প্রস্তুত নহে। বার বার আপীল করিবারও রামপ্রসাদের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। রাজনৈতিক মামলায় ইংরাজ সরকারের আদালতে সুবিচার পাইবার যে কোনই আশা নাই ইহা

স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেওয়াই ছিল তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ডাকাতির সময় কাহার গুলিতে লোক মরিয়াছিল তাহা নিঃসংশয়রূপে আদালতে প্রমাণ হয় নাই। তথাপি চারচার জন লোককে মৃত্যুদণ্ডে কেন দণ্ডিত করা হইল তাহার একটা সদুত্তর সরকারী আদালত হইতে পাইবার উদ্দেশ্যেই রামপ্রসাদ বারবার আপীল করিয়াছিলেন। সে সদুত্তর রামপ্রসাদ পাইয়াছেন, দেশবাসী তাহা কানে শুনিয়াছে। সম্রাটের হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইবার চেষ্টা সরকারের চক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধ। ফৌজদারী আইনের অন্য ধারা অনুসারে দোষী হউক আর না হউক, ১২১ক ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত হইলে এবং ষড়যন্ত্রের নেতৃস্থানীয় বলিয়া প্রমাণিত হইলে তাহাকে যে চরমদণ্ডে দণ্ডিত হইতেই হইবে—এই কথাটি প্রমাণ করিবার জন্যই রামপ্রসাদ এত আইন আদালত ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছিলেন। তারপর নিজের সরল বিশ্বাসের কথা, মতপরিবর্তনের কথা, দেশবাসীকে শুনাইয়া যাইবার একটা আকাঙ্ক্ষা তো ছিলই। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে রামপ্রসাদের তথাকথিত আবেদন-নিবেদনের অর্থ খুবই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। দেশবাসী যে তাঁহার কার্যের ভুল ব্যাখ্যা করিবে না এ বিশ্বাস রামপ্রসাদের ছিল: আজ তাঁহার জীবনের সমস্ত কথা দেশবাসীর সম্মুখে রাখিয়া আমরাও আশা করি যে ইংরাজের আদালতে রামপ্রসাদ যে অপরাধেই অপরাধী বলিয়া প্রতিপন্ন হউন না কেন, দেশের আদালতে, দেশবাসীর বিচারে তিনি কাপুরুষতা বা দুর্বলতার দায়ে অপরাধী সাব্যস্ত হইবেন না।

১৯২৭ সনের ১৮ই ডিসেম্বর। ১৯শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে ফাঁসি হইবে। গোরখপুর জেলে আপনার ক্ষুদ্র কক্ষে রামপ্রসাদ ফাঁসির

প্রতীক্ষায় প্রহর গণনা করিতেছেন। রাত্রি প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সব ফুরাইবে।

কারাকক্ষের ম্লান আলোতে বাহিরের অন্ধকার গভীরতর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। কিন্তু রামপ্রসাদের সে দিকে কোনই লক্ষ্য ছিল না, তাঁহার মন তখন কোন এক অপার্থিব লোকে বিচরণ করিতেছিল। সম্মুখে তাহার উন্মুক্ত ভগবদ্‌গীতা।

তিনি ভাবিতেছিলেন—বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়—আত্মার তো মৃত্যু নাই, সে আধার পরিবর্তন করে মাত্র। রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি এক রূপ পরিবর্তন করিয়া অন্য এক রূপ গ্রহণ করিবেন, তাহাতে শঙ্কিত বা বিচলিত হইবার কি কারণ আছে? তাঁহার আরও মনে পড়িতেছিল, মানুষ ভগবানের হাতের যন্ত্র মাত্র। ভগবান যদি তাহা ব্যবহার করিতে না চান তাহা হইলে যন্ত্র আপত্তি করিবে কেন? তিনি মনশ্চক্ষুতে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে মহামহিমাময় স্বর্গরাজ্যের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে, স্পষ্ট কানে আসিল কে যেন পরম আদরে কাছে আসিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন।

বাহিরে বোধহয় প্রহরী পরিবর্তন হইল। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকিতে রামপ্রসাদের সুখস্বপ্ন টুটিয়া গেল। তিনি আপনার অন্তরে বাহিরে বাস্তবতার কঠিন স্পর্শ অনুভব করিলেন।

এইবার তাঁহার চিন্তাধারা ভিন্ন পথে পরিচালিত হইল। অতীত আর অতীত রহিল না, সে ইতিহাসের প্রত্যেকটি অধ্যায় জ্বলন্ত জীবন্ত হইয়াই যেন তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল! এ কি এক বিরাট ব্যর্থতার ইতিহাস! আজীবনের সে কঠোর সাধনা, তিল তিল করিয়া আত্ম-বলিদান, অপমান নির্যাতনের দুঃসহ বেদনা—এ সমস্তের পরিণাম ফাঁসিকাষ্ঠ ভিন্ন অপর কিছুই নহে? জননীর শৃঙ্খলভার

যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গেল—তবে এ আত্ম-বিসর্জন—এ আত্মহত্যা কিসের জন্য? সাধনা যদি সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিল তাহা হইলে সে সাধনার মূল্য কি?

রামপ্রসাদ আজ আত্মস্থ। আপনার মধ্যে তিনি আজ সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে খুঁজিয়া পাইয়াছেন। এ প্রশ্নেরও উত্তর আসিল তাঁহার আপনার হৃদয় হইতে। সাধারণ দৃষ্টিতে যাহাকে ব্যর্থতা বলিয়া মনে হইতেছে তাহা যে ব্যর্থতা নয়! বাঁধাধরা মাপকাঠি দিয়া যাহা মাপা যায় না, টাকা-আনা-পয়সার হিসাব যাহার মূল্য নিরূপণ হয় না তাহাকেই যদি ব্যর্থতা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে সার্থকতা শব্দটির অর্থকে কি নিতান্তই সঙ্কীর্ণ করিয়া দেওয়া হয় না? আত্মত্যাগ, আত্মত্যাগ—তাহা আত্মহত্যা নহে। আত্মহত্যা ধ্বংসের প্রতীক, আত্ম-ত্যাগ সৃষ্টির উৎস। জননীর শৃঙ্খলভার মোচন করিতে যাইয়া যদি ফাঁসির দড়িতে প্রাণ বিসর্জন করিতে হয় তাহাতে নৈরাশ্য বা দুঃখের কারণ কি আছে? এ মৃত্যু মৃতের জন্য অমরত্ব আহরণ করিয়া আনে না, ইহা জীবিতের প্রাণে চরম আত্মত্যাগের প্রেরণা সঞ্চার করে। সেই জন্যই ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণদান করাকে আত্মহত্যার সঙ্গে তুলনা করা চলে না। ভারত-জননী এক দিনে দাসত্ব শৃঙ্খলভার পরেন নাই; তাই এক দিনে তাঁহার সেই ভার মোচন করা যাইবে না। তাঁহার প্রত্যেকটি সন্তানের হৃদয়হীনতা ও বিশ্বাসঘাতকতা একটির পর একটি গ্রন্থি রচনা করিয়া যে সুদীর্ঘ শৃঙ্খলের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে এক জন দুই জন বা দশ জনের প্রচেষ্টাই তো আর যথেষ্ট হইতে পারে না? সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যে বন্ধনের সৃষ্টি হইয়াছে, সুদীর্ঘকাল ধরিয়া তাহা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে হইবে; সহস্র সহস্র সন্তান মায়ের পায়ে যে বন্ধন পরাইয়া দিয়াছে তাহা ভাঙ্গিতে সহস্র সন্তানের চেষ্টার

প্রয়োজন হইবে। শত শত বৎসরের সঞ্চিত পাপ ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে হইলে শত শত সন্তানের রক্তদান না করিলে চলিবে কেন? আপাত-দৃষ্টিতে এই রক্তদানের কোনই সার্থকতা না থাকিতে পারে—এমন কি, আত্মহত্যা বলিয়াও প্রতীয়মান হইতে পারে কিন্তু ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক এইরূপ প্রত্যেক রক্ত-বিন্দুর হিসাব না লইয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতে পারিবেন না। রামপ্রসাদ চোখের সম্মুখে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে তাহার রক্তাঞ্জলি দেবীর চরণ স্পর্শ করিয়াছে, তাঁহার প্রত্যেক রক্তবিন্দু দেশের মাটিকে উর্বর করিয়া শত শত বীর সৃষ্টি করিবার কার্যে সহায়তা করিতেছে। এতক্ষণ অতীতের ব্যর্থতার কথাই কেবল মনে হইতেছিল, এখন এক গরিমাময় ভবিষ্যতের চিত্র চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল—সে চিত্র স্বাধীন ভারতবর্ষের চিত্র, সহস্র সন্তানের উত্তপ্ত হৃদয় শোণিতে অভিষিক্ত ভারতভূমির জগৎপালিনী জগদ্ধাত্রী-মূর্তি, জ্ঞান ও ধর্ম, শিল্প ও কলা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের জন্মদাত্রী ভারত-ভূমি রণক্লান্ত বিশ্বকে শান্তির অমৃতমন্ত্র শোনাইতেছেন। রামপ্রসাদের সমস্ত মনস্তাপ দূর হইয়া গেল। তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে ব্যাকুল সনির্বন্ধ প্রার্থনা ধ্বনিত হইয়া উঠিল, "জননী ভারতভূমি আমার, তোমার জন্য একবার মরিয়া যে মৃত্যুর পিপাসা মিটিল না। আমাকে আরও শত শত জন্ম দাও, যেন শত শত বার তোমার চরণে বুকের রক্ত-অঞ্জলি প্রদান করিতে পারি।"

পূর্ব গগন ধীরে ধীরে পরিষ্কার হইয়া আসিতেছিল। জল্লাদকে সঙ্গে লইয়া জেলার সাহেব তাহার গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামপ্রসাদ প্রস্তুত ছিলেন, স্মিতমুখে বাহির হইয়া আসিলেন। ফাঁসি-কাষ্ঠ পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। রামপ্রসাদ অকম্পিত পদক্ষেপে তাহাতে আরোহণ করিলেন। জল্লাদ তাঁহার গলায় দড়ি পড়াইল। এ জনমের

মত শেষ বার রামপ্রসাদের মুখ হইতে বাহির হইল, "I wish the downfall of the British Empire." তারপর সব শেষ।

বোধ হয় তাহারই এক ঝলক বুকের রক্ত পূর্ব গগনকে তখন লাল-রঙে রাঙাইয়া দিয়াছে।

আসফাকউল্লা খাঁ

ভারতের মুসলমান ভারতের জন্য দরদ অনুভব করে না এই অভিযোগ অনেক হিন্দুর মুখেই শোনা যায়। ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতের জলবায়ুতে পরিবর্ধিত হইয়াও রবীন্দ্রনাথের কুষ্মাণ্ডের মত তাহারা আরব, পারস্য, তুরস্কের সঙ্গে মিতালী করিবার প্রয়াস পায়। স্বাধীনতার সংগ্রামে কোন দিনই তাহারা আন্তরিকতাব সহিত যোগ দেয় নাই, বরং পদে পদে বাধা দিয়াই আসিয়াছে। যাহারা যোগ দিয়াছে তাহারাও শেষ পর্যন্ত টিকিয়া থাকিতে পারে নাই, অধিকাংশই বিজয়ের মুখে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সমস্ত অন্দোলনকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই সমস্ত কারণে বর্তমানকালে এক শ্রেণীর হিন্দু রাজ-নীতিকগণ মুসলমানকে বাদ দিয়াই ভারতে স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনা করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিতেছেন। বিপ্লববাদীদিগের মনে মুসলমান-গণের প্রতি এই অবিশ্বাস অধিকতর দৃঢ়বদ্ধ। কোন প্রদেশেই তাহারা বিশ্বাস করিয়া মুসলমানকে দলে ভর্তি করিতে সাহস পায় না। বলিতে কি মুসলমানকে বর্জন করিবার নীতির উপরেই এতদিন বিপ্লব আন্দোলন

চলিযা আসিয়াছে। আসফাক উল্লার আত্মদানের দৃষ্টান্ত বৈপ্লবিকদিগের এই মনোবৃত্তির কথঞ্চিৎ পরিবর্তন করিতে সাহায্য করিবে কি না একমাত্র ভবিষ্যৎই আমাদিগকে সে কথা বলিতে পারিবে। ইতিমধ্যে আমরা কেবল এই কথাই বলিতে চাই যে, স্বদেশের জন্য ফাঁসির দড়িতে হাসিতে হাসিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়া আসফাক উল্লা ভারতীয় "মুসলমান-দিগের সম্মুখে যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন তাহা যদি মুসলমানসমাজ আংশিকরূপেও গ্রহণ করিতে পারে তাহা হইলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম অচিরেই সাফল্যমণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারে।

শাহজাহানপুরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে আসফাক উল্লা খাঁর জন্ম হয়। এই বংশের কেহ কোনদিন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ-দান করেন নাই। দেশের জন্য কষ্ট স্বীকার করা কাহাকে বলে তাহা এই বংশের কেহ জানিতেন না। সম্ভ্রান্ত মুসলমানদিগের জীবন যেমন করিয়া নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় কাটিয়া যায় তেমন করিয়াই আসফাকউল্লার পিতৃপিতামহগণ আরামে দিন কাটাইতেন। এই বংশে কেমন কবিয়া আসফাক উল্লার মত পুত্রের জন্ম হইল তাহা ভাবিয়া সকলকেই আশ্চর্য হইতে হয়। কিন্তু একথা সত্য যে কোন প্রকার পারিবারিক আবহাওয়ার সাহায্য না পাইয়াও আসফাক নিজের আন্তরিক সংস্কারবশেই দেশকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিলেন। অপর কাহারও নিকট হইতে ধার করিতে হয় নাই বলিয়াই বোধ হয় স্বদেশপ্রেম এমন সুদৃঢ়ভাবে তাহার অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল।

বাল্যে পড়াশুনার প্রতি আসফাক উল্লার তেমন কিছু অনুরাগ ছিল না। সন্তরণ করিতে, অশ্বারোহণ করিতে এবং শিকার করিতেই সে বেশী ভালবাসিত। অন্যান্য দুষ্ট বালকদের সঙ্গে মিলিয়া প্রতিবেশীর প্রতি দৌরাত্ম্য করিতেও তাহার সমতুল্য সে অঞ্চলে বড় কেহ ছিল না।

তাহার এই দৌরাত্ম্যে লোকের ক্ষতি হইত সন্দেহ নাই কিন্তু এই প্রিয়-দর্শন বালকটির এমন কতকগুলি গুণ ছিল যাহার জন্য কেহই তাহার উপর রুষ্ট হইতে পারিত না। সেবা ও ত্যাগপ্রবৃত্তি ছিল তাঁহার বাল্য-জীবনের বিশেষত্ব। জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলিয়া রোগীর সেবা, তৃষ্ণার্তকে জলদান, বিপন্নের উদ্ধার, দুর্ভিক্ষগ্রস্তের সাহায্য প্রভৃতি কার্যে তাহার অপার উৎসাহ পরিলক্ষিত হইত। তাহার কোন প্রতিবেশী হয়তো একদিন বাগানে বেড়াইতে যাইয়া দেখিতে পাইল যে, সযত্নে রক্ষিত আমগুলি কে বা কাহারা লুটিয়া লইয়া গিয়াছে, খোঁজ লইয়া সন্ধানও মিলিল, এ কাজ আসফাক ও তাহার চির সহচরদের। দুষ্টু ছোকরাকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে মনে করিয়া প্রতিবেশী ঘরে ফিরিয়াই হয়তো দেখিতে পাইল যে সেই পরম অশিষ্ট বালকটি তাঁহারই রুগ্ন পুত্রের শয্যাপার্শ্বে পরম শিষ্টভাবে বসিয়া সযত্নে সুনিপুণ হস্তে সেবা করিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া শাস্তি দিবার সঙ্কল্প তাহার অন্তর হইতে নিমেষে কর্পূরের মত উড়িয়া যাইত।

আসফাক পড়াশুনায় মনোযোগ দিতে পারিত না, ইহার অর্থ ইহা নহে যে পুস্তক দেখিলেই তাহার গায় জ্বর আসিত। বিদ্যালয়ের বাঁধাধরা পাঠ্য-তালিকার মধ্যে তাহার মন ধরিত না সত্য কিন্তু বাহিরের পুস্তক পাঠ করিয়া জ্ঞান সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি তাঁহার খুবই প্রবল ছিল। ভারতবর্ষের প্রতি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার একটি ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল। ভারতের অতীত ইতিহাস, ভারতের বীর-বীরাঙ্গনার কাহিনী, ভারতের সাধু-মহাপুরুষদিগের জীবনকথা পড়িতে পড়িতে এই কিশোর বালকের ভাবপ্রবণ হৃদয়ে কতপ্রকার ভাবের স্রোত বহিয়া যাইত। বালক ইতিহাস পড়িত। মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় কেমন করিয়া একদিন পলাশীক্ষেত্রে বাঙলার তথা ভারতের স্বাধীনতাসূর্য অকালে অস্ত গিয়াছিল

তাহা পড়িতে পড়িতে তাহার সুন্দর চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া আসিত। আবার যখন সে সিপাহীবিদ্রোহের গরিমাময় ইতিহাস পাঠ করিত তখন গর্বে ও আনন্দে তাহার ক্ষুদ্র বক্ষখানি দুলিয়া উঠিত, সঙ্গে সঙ্গে তাহার কল্পনাপ্রবণ হৃদয়ে কত ছবিই ভাসিয়া উঠিত—ভবিষ্যতের ছবি—একদিকে ইংরাজ সৈন্য আধুনিক সমস্ত যুদ্ধোপকরণে সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান, অপর দিকে ত্রিশকোটি ভারতবাসী—যুদ্ধের প্রচুর উপকরণ নাই, কিন্তু প্রাণে সঙ্কল্প আছে। বালক আসফাক কল্পনানেত্রে আপনাকে ভারতীয় সৈনিকদলে এক ক্ষুদ্র অথচ কর্মঠ পদাতিক সৈনিকরূপে দেখিতে পাইত। তাহার কেবলই মনে হইত এ স্বপ্ন কি চিরকাল স্বপ্ন থাকিয়া যাইবে,—সাধকের কল্পনা কি বাস্তবে পরিণত হইবে না?

আসফাক কেবল অতীতের ইতিহাস আলোচনা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত না, বর্তমান ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কাহিনী পাঠ করিতেও তাহার যথেষ্ট উৎসাহ পরিলক্ষিত হইত। তখনও কংগ্রেসী রাজনীতি আবেদন নিবেদনের উর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই; নরমপন্থী কংগ্রেস নেতাদের বক্তৃতা ও কার্যাবলী আসফাক যখন বিপ্লববাদীদিগের বাক্যাড়ম্বরহীন কাযাবলীর সঙ্গে তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখিত তখন এই সমস্ত সর্বত্যাগী তরুণ কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধায় তাহার প্রাণ কানায় কানায় পারিপূর্ণ হইয়া উঠিত। এই বিপ্লববাদীরা কেমন মানুষ, কেমন করিয়া, কোন্ সাধনার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া তাহারা মৃত্যুকে হাসিতে হাসিতে উল্লঙ্ঘন করিয়া যায় তাহা ভাবিয়া আসফাকের বিস্ময়ের সীমা আর পরিসীমা থাকিত না। এই মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের কাহারও সংস্পর্শে আসিবার জন্য তাহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিত, প্রার্থনা করিবার সময় বালক তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সমস্তটুকু একাগ্রতা দিয়া ভগবানের চরণে আপনার এই ঐকান্তিক বাসনার কাহিনী নিবেদন করিয়া দিত।

এমনই যখন তাহার মনের অবস্থা তখন হঠাৎ একদিন আসফাক মৈনপুরী ষড়যন্ত্রের কাহিনী শুনিতে পাইল। সঙ্গে সঙ্গে সে ইহাও জানিতে পারিল যে, শাহজাহানপুর নগরেই ঐ ষড়যন্ত্রের অন্যতম নেতা শ্রীরাম-প্রসাদ বিস্মিল তাহার জন্মের বহুপূর্ব হইতে বিপ্লবের কাজ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু আসফাক এই সংবাদ যখন পাইল তখন শুভ অবসর বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পুলিশের গুপ্তচরদিগের শ্যেন-দৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে,রামপ্রসাদ তখন শাহজাহানপুর হইতে পলাতক। আসফাক সমস্ত নগর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও রাম-প্রসাদের কোন সন্ধান পাইল না। আসফাক আত্মানুশোচনায় দগ্ধ হইতে লাগিল। এত কাছে থাকিতেও সে তাহার বাঞ্ছিত গুরুর সন্ধান পায় নাই। দুইএকবার রামপ্রসাদের উপর রাগও হইল। সেই না হয় তাহাকে খুঁজিয়া লইতে পারে নাই, কিন্তু রামপ্রসাদ তো তাহাকে নিজের কাজে ডাকিয়া লইতে পারিত। অনুশোচনা অনুশোচনাই রহিয়া গেল বটে, কিন্তু রামপ্রসাদের অস্তিত্বজ্ঞান তাহার হৃদয়নিহিত প্রবৃত্তিকে অধিকতর সচেতন ও সজাগ করিয়া দিয়া গেল। রামপ্রসাদের সুদীর্ঘ নির্বাসন কালের মধ্যে আসফাক উল্লার হৃদয়ের আগুন নিভিয়া গেল না, বরং প্রতীক্ষার আকুলতা তাহাকে দিনের পর দিন বাড়াইয়া তুলিতে লাগিল।

তারপর সত্য সত্যই একদিন আসফাকের জীবনের স্বপ্ন সফল হইয়া উঠিল। সম্রাটের ঘোষণাবাণী প্রকাশিত হইবার পর রামপ্রসাদ স্বাধীন ভাবে শাহজাহানপুরে ফিরিয়া আসিলেন। আসফাক তাহাকে দেখিতে পাইল, কিন্তু প্রথম প্রথম সাহস করিয়া তাহার সঙ্গে আলাপটুকু পর্যন্ত করিতে পারিল না। কিন্তু গরজ যে তাহারই বেশী। বিপ্লব আন্দোলনের জন্য কাজ করিবার তীব্র বাসনা যাহার অন্তরে ধ্বক ধ্বক করিয়া

জ্বলিতেছে সে কি আর তুচ্ছ সঙ্কোচের জন্য সে আগুনের মুখে পাথর চাপা দিয়া রাখিতে পারে? আসফাকও পারিল না। কয়েকদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া একদিন সে সাহস করিয়া রামপ্রসাদের সঙ্গে নিজেই আলাপ করিয়া ফেলিল। তাহার এই ব্যবহারে রামপ্রসাদও আশ্চর্য হইয়া গেল। পুলিশের কৃপাদৃষ্টির ভয়ে বন্ধুবান্ধবও যখন ছায়া মাড়াইতে ভয় পায় তখন এক অপরিচিত তরুণ বয়স্ক মুসলমানকে তাহার সঙ্গে যাচিয়া আলাপ করিতে দেখিয়া বামপ্রসাদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না।৩ ইহার উপর আসফাক যখন তাহার সঙ্গে দেশের কথা লইয়া আলাপ আলোচনা কবিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল তখন রামপ্রসাদের বিস্ময় সন্দেহে পরিণত হইল। একে তো সে আর্যসমাজের লোক, তাহাতে আবার বিপ্লবী। তাহাব ধর্ম, সংস্কার ও শিক্ষা সমস্তই তাহাকে মুসল-মানকে অবিশ্বাস করিতে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। তাই রামপ্রসাদ প্রথম প্রথম আসফাক উল্লা হইতে আপনাকে যথাসম্ভব দূরে রাখিয়াই প্রয়াস পাইতে লাগিল। কিন্তু সত্য ও মিথ্যা উভয়েরই এক একটা নিজস্ব রূপ আছে, সে রূপ মানুষের চোখে ধরা না পড়িয়া পারে না। এ ক্ষেত্রেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না। আপনার সমস্ত সন্দেহ ও কুসংস্কার থাকা সত্বেও রামপ্রসাদ আসফাক উল্লার সরলতা ও আন্তরিকতা দ্বারা অভিভূত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই রামপ্রসাদ আসফাক উল্লাকে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। তারপর যুক্তপ্রদেশে যখন একটা সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম-পদ্ধতি লইয়া বিপ্লবকার্য আরম্ভ হইল তখন কেন্দ্রীয় সমিতির সভ্যগণের সম্মতি লইয়া রামপ্রসাদ আসফাক উল্লাকে আপনার প্রধান সহকারীর পদে নিযুক্ত করিলেন। আসফাক যে এই বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিল তাহার পরবর্তী জীবনের ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ বর্তমান রহিয়াছে।

আসফাক সাচ্চা মুসলমান ছিল, তাই সাধারণ মুসলমানের মত হিন্দু-দিগকে ঘৃণা বা বীতশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত না। তাহার এই হিন্দু-প্রীতির জন্য গোড়া মুসলমানদের অনেকেই তাহাকে 'কাফের' আখ্যায় ভূষিত করিয়াছিল। পক্ষান্তরে সঙ্কীর্ণমনা হিন্দুগণ তাহাকে মুসলমান বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিত। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কর্তৃকই ঘৃণিত হইয়াও আসফাক সত্যপথ হইতে বিচলিত হয় নাই। সাধারণ লোক হইলে অন্তত এক সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা অর্জন করিবার জন্য হয় তো সে আপনাকে গোড়া মুসলমানের দলে ভর্তি করিয়া লইত, না হয় তো ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজের সঙ্গে আপনাকে মিলাইয়া লইবার প্রয়াস পাইত। কিন্তু আসফাক এ কথা মর্মে মর্মে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ধর্মে খাঁটি মুসলমান থাকিয়াও সে হিন্দুদিগের সঙ্গে আন্তরিক সৌহার্দ্য স্থাপন করিতে পারে; তাই সকলের নিন্দা বিদ্রূপ হাসিমুখে উপেক্ষা করিয়া সে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সত্যপথে অটল বিশ্বাসে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিয়াছিল।

স্বধর্মাবলম্বীদিগের নীচতা দেখিয়া আসফাক মর্মে মর্মে ব্যথা অনুভব করিত। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য হিন্দুদিগের অপরিসীম ত্যাগের সঙ্গে সে যখন মুসলমানদিগের ঔদাসীন্য তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখিত তখন লজ্জায় তাহার মাথা মাটির নীচে লুকাইতে ইচ্ছা হইত। বিপ্লব আন্দোলনে যোগদান করিবার পর আসফাক মুসলমান যুবকদিগকে দলে টানিয়া আনিবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিয়াছে। তাহার জীবনকালে সে চেষ্টা সফল হয় নাই; তাহার মৃত্যুর পর অন্য কিছুর জন্য না হইলেও কেবল-মাত্র তাহার পরলোকগত আত্মার তুষ্টি বিধানের জন্যও কি মুসলমান সম্প্রদায়—বিশেষ করিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের যুবক-বৃন্দ স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করিবে না?

আসফাক রামপ্রসাদকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত। এই শ্রদ্ধা অতি অল্পদিনের মধ্যেই অন্তরঙ্গ ভালবাসায় পরিণত হইয়াছিল। এই ভালবাসা কত গভীর ও আন্তরিক ছিল তাহা একটি উদাহরণ হইতেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। আসফাক রামপ্রসাদকে নাম ধরিয়া ডাকিত না, আদর করিয়া কেবল 'রাম' বলিয়াই তাহাকে সম্বোধন করিত। একবার আসফাকের বড় অসুখ, মাঝে মাঝে মূর্ছা হইতেছে। এইরূপ মূর্ছিত অবস্থায় হঠাৎ সে রাম রাম বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার আত্মীয়-স্বজনও বিস্মিত। মুসলমান যুবক বিকারের ঘোরে রাম রাম বলিয়া চীৎকাব করিতেছে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্যের কথা আর কি হইতে পারে? মোল্লা আসিল, মৌলবী আসিল, সকলে তাহার কানে কানে 'আল্লা' 'আল্লা' উচ্চারণ করিয়া তাহার কাফের মনকে ইসলামের প্রতি ফিরাইবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। কিন্তু আসফাক রাম নাম ছাড়িল না। ঘটনাক্রমে ঠিক এমনই সময়ে তাহার এক বন্ধু আসিয়া উপস্থিত। এই বন্ধুটি রামপ্রসাদকে চিনিত, রামপ্রসাদ ও আসফাকের মধ্যে কি মধুর সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাও তাহার অবিদিত ছিল না। তাই আসফাককে অনবরত রাম রাম বলিতে শুনিয়া সে বুঝিতে পারিল যে বিকারের মধ্যেও রোগী তাহার গুরু ও বন্ধু রামপ্রসাদকে ভুলিতে পারে নাই। তখনই রামপ্রসাদকে ডাকিয়া পাঠান হইল। সংবাদ পাইবামাত্র রামপ্রসাদ ছুটিয়া আসিয়া আসফাকের রোগতপ্ত মস্তক সাদরে আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। সে স্পর্শ তড়িৎশক্তির ন্যায় কার্যকরী হইল, অতি অল্পকাল মধ্যেই প্রচণ্ড বিকারের রোগী প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল। বস্তুত এমন আন্তরিক ভালবাসা না থাকিলে কেহই বোধ হয় কেবলমাত্র কর্তব্যের খাতিরে আর একজনের ইঙ্গিতে নিশ্চিত মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ করিতে ছুটিতে পারে না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে অসহযোগ আন্দোলনের পর যুক্তপ্রদেশে নূতন করিয়া বিপ্লবদল সংগঠন করিবার চেষ্টা হইতেছিল এবং রামপ্রসাদকে এই প্রদেশের জন্য প্রধান কার্যকর্তা নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই সংগঠন-কার্যে রামপ্রসাদ আসফাক উল্লার নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। শারীরিক এবং আর্থিক সমস্ত ক্ষতি সহ্য করিয়া আসফাক যুক্তপ্রদেশের নগরে নগরে এবং গ্রামে গ্রামে যাইয়া শাখাসমিতি গঠন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। বর্তমান ভারতে সাধারণ যুবকদিগের মনোবৃত্তি কিরূপ তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সেই মনোবৃত্তিকে পরিবর্তন করিয়া চরমপন্থী বিপ্লববাদীতে পরিণত করা কত যে কঠিন সে সম্বন্ধে দেশসেবকমাত্রই ধারণা করিতে পারেন। আসফাক এই আয়াসসাধ্য কার্য যে নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা ও ধৈর্যের সহিত সম্পন্ন করিতেছিলেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

অর্থাভাবে রামপ্রসাদ যখন বাধ্য হইয়া সরকারী টাকা লুঠ করিতে সংকল্প করেন তখন সর্বপ্রথম তাহাকে তাহার প্রধান সহকারী আসফাক উল্লার সাহায্যই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। স্বদেশের জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ কোন যুবকই সাধারণ ডাকাতি করিতে সহজে সম্মত হয় না। তাই ডাকাতির প্রস্তাব প্রথমে আসফাক উল্লাও সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। কিন্তু অনেক বাদানুবাদ, অনেক আলোচনার পর তিনি এই কার্য করিতে সম্মত হন। রামপ্রসাদ নিজে বুঝিয়াছিলেন, তাহাকেও বুঝাইয়াছিলেন যে, সংসারে কোন কার্যই নিন্দনীয় নহে; ভগবান মানুষের সংকল্পের দিকে চাহিয়াই তাহার কার্যের ঔচিত্যানুচিত্য বিচার করিয়া থাকেন। আসফাক তাই সর্বকর্মফল ভগবানে সমর্পণ

করিয়া নিষ্কাম কর্মীর দৃঢ়তা ও ঔদাসীন্য লইয়া ট্রেণ ডাকাতির সংগঠন-কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

কেমন সুশৃঙ্খল ও সুনির্দিষ্টভাবে চলন্ত গাড়ীকে দাঁড় করাইয়া মুষ্টিমেয় যুবক সরকারী টাকা লুণ্ঠন করিয়া উধাও হইয়া গিয়াছিলেন তাহা আমরা এই গ্রন্থের প্রারম্ভেই বর্ণনা করিয়াছি। এমন সুশৃঙ্খলভাবে এত বড় একটা কাজ করিতে কেমন সুনিয়ন্ত্রিত সংগঠনের প্রয়োজন তাহা প্রত্যেকেই অনুমান করিতে পারে। আসফাকের সহায়তায় রামপ্রসাদ এই সংগঠন-কার্য সুচারুরূপেই সম্পন্ন করিয়াছিলেন। যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে পুলিশের চক্ষু বাঁচাইয়া কর্মীদিগকে এত বড় একটা কাজের জন্য একত্র করা সহজ কাজ নহে। কিন্তু রামপ্রসাদ এই কার্য নিতান্ত সহজভাবেই করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই ডাকাতিতে কয়েকজন তরুণ বয়স্ক যুবক যে সাহস, ধীরতা, তৎপরতা ও নিয়মানুবর্তিতা দেখাইয়াছিলেন তাই মনে করিয়া সকল কালে সকল দেশের লোকই বিস্ময়ে অভিভূত হইবে। বীরত্ব মন্দ কাজের জন্য হইলেও বীরত্ব। কার্যের যতই আমরা নিন্দা করি না কেন রামপ্রসাদ ও তাহার সহকর্মীদের বীরত্বের প্রশংসা আমাদিগকে মুক্তকণ্ঠে করিতেই হইবে। আমাদিগকে ভুলিলে চলিবে না যে, ইহারা গুপ্তভাবে ভারতে এক বিপ্লব আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সে বিপ্লব-কার্যকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে কর্মীদিগের মধ্যে যে সমস্ত গুণ থাকা প্রয়োজন আসফাক প্রভৃতির সকলের মধ্যেই তাহা প্রচুর পরিমাণে ছিল। অকালে ইহাদের জীবন এমনভাবে বিনষ্ট না হইলে ইহারা হয়ত সত্য সত্যই ভারতে এক সশস্ত্র বিপ্লবের সৃষ্টি করিতে পারিত।

গুপ্ত পুলিশের সাহায্যে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া যুক্ত-প্রদেশের সরকার যেদিন সমস্ত বিপ্লববাদীদিগের গৃহ খানাতল্লাশী করিয়া তাহা-

দিগকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দিয়াছিলেন সেদিন সৌভাগ্যক্রমে আসফাক শাহজাহানপুরে তাহার নিজের গৃহে উপস্থিত ছিলেন না। তাই গ্রেপ্তার এবং খানাতল্লাশীর খবর পাইবামাত্র তিনি আত্ম-গোপন করিতে সংকল্প করেন। আসফাক নিজের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করেন নাই। বিপ্লববাদী ও অসহযোগ মতবাদের পার্থক্য আছে। অসহযোগী সমস্ত দেশবাসীর সহানুভূতি পাইবার আশা করে আর বিপ্লববাদী এই ব্যাপারটিকে নিতান্তই অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করিয়া থাকে। ইতরভদ্রনির্বিশেষে সকলেই দেশপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া দেশের জন্য প্রাণদান করিতে ছুটিয়া আসিবে জগতের ইতিহাসে কোথাও এই উক্তির নজীর না পাইয়া তাহারা স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর যুবকদের সহযোগিতার উপরেই নির্ভর করিতে চায় এবং এই সংখ্যার অল্পতার জন্যই তাহারা আপনাদিগকে প্রাণপণে পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি হইতে দূরে রাখিতে চায়। আসফাক উল্লা আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন নিজের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য নহে, নিজে বাঁচিয়া থাকিয়া বিপ্লব আন্দোলনকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য।

আসফাকের গুপ্ত জীবন কেমন করিয়া কাটিয়াছে আমরা তাহার বিবরণ প্রদান করিতে অসমর্থ। সরকার তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিলে তিনি হয়ত কোনদিন আপনার জীবনের এই অধ্যায়টির রোমাঞ্চকর কাহিনীগুলি স্বদেশবাসীর অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু সরকার সে পথে চিরকালেন জন্য কুঠারাঘাত করিয়াছেন। প্রায় একবৎসর কাল পুলিশের দৃষ্টি হইতে আত্মগোপন করিতে হইয়াছে। আসফাক উল্লাকে হয়ত-বা কত কষ্টই সহ্য করিতে হইয়াছে। বিদেশী রাজার আইনে নিজের দেশে যার মাথা তুলিয়া চলিবার ক্ষমতা নাই, পদে পদে ঘৃণিত চোর-ডাকাতের মত যাহাকে গুপ্ত পুলিশের হাত

হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে হয় সে জীবন যে কতবড় দুঃসহ তাহা হয়ত ভুক্তভোগী ভিন্ন অপর কেহ কল্পনাও করিতে পারিবে না। হয়ত বা কত অনলবর্ষী মধ্যাহ্ন-সূর্যের উত্তাপ তাহার মাথার উপর দিয়া গিয়াছে, কত দুর্যোগময়ী অমাবস্যার রাত্রিতে হয়ত-বা তাহাকে নগ্নপদে অনাবৃত মস্তকে তেপান্তর মাঠের ভিতর দিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে হইয়াছে, কতদিন হয়ত-বা অনাহারে, কতদিন অর্ধাহারে কাটাইয়া কত নিদ্রাহীন রজনীতে দুশ্চিন্তার বৃশ্চিক যাতনায় জ্বলিতে জ্বলিতে, কত দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়াই না হয়ত তাহাকে এই সুদীর্ঘ এক বৎসর কাল কাটাইতে হইয়াছে। শোনা যায় আসফাক উল্লা ছদ্মবেশ ধারণ করিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। গ্রেপ্তারের পর তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, নিম্ন আদালতে তাহার সহকর্মীদের যখন বিচার চলিতেছিল তখন দুইএকদিন তিনি পাঞ্জাবী ছদ্মবেশে আদালতে পর্যন্ত উপস্থিত হইয়া বিচারের অভিনয়টিকে উপভোগ করিয়াছেন। ছদ্মবেশ ধারণ করিবার এমন দক্ষতা না থাকিলে আসফাক হয়ত এত সুদীর্ঘকাল টিকটিকিবহুল দেশে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

এইরূপ গুপ্ত জীবন যাপন করিবার সময় একটি কথা আসফাক উল্লার মনে হইয়াছিল। বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া ভারতে বিপ্লবের জন্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা বিপ্লবাবদীদিগের কর্মপদ্ধতির এক প্রধান অঙ্গ। দিবানিশি প্রাণ বাঁচাইয়া চলিয়া ভারতে তাহার যে আর তেমন ভাবে বিপ্লব কার্য পরিচালন করা সম্ভব হইবে না তাহা আসফাক বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই কোনরূপে ভারত হইতে বাহিরে যাইয়া ঐরূপ উপায়ে বিপ্লব কার্যে সহায়তা করিবেন এই সংকল্প লইয়া তিনি আফগান রাজদূতের সঙ্গে দেখা করিতে চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৯২৬ সালে আগষ্ট মাসের শেষভাগে দিল্লীতে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু

এই চেষ্টাই তাহার কাল হইল। এত সতর্কতাসত্ত্বেও ৮ই সেপ্টেম্বর তিনি পুলিশের হাতে বন্দী হইলেন। বিপ্লব প্রচেষ্টার জন্য তাহার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছিল আবার বিপ্লব প্রচেষ্টার জন্যই তিনি ধৃত হইলেন।

আসফাক কেমন করিয়া জাতীয়তার বেদীমূলে সাম্প্রদায়িকতাকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহা একটি ঘটনা হইতেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। লক্ষ্ণৌ জেলে অবস্থান কালে একদিন স্থানীয় মুসলমান পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট্ তাহার সঙ্গে দেখা করেন। তিনি একে পুলিশ, তাহাতে মুসলমান। তাই মানবহৃদয়ের নিতান্ত নীচ প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়াও তিনি স্বীয় অভিষ্ট সাধন করিতে চেষ্টা করিলেন। আসফাককে নির্জনে ডাকিয়া লইয়া গিয়া তিনি বলিলেন, "দেখ, তুমিও মুসলমান, আমিও মুসলমান। তাই তোমার দুঃখে আমার হৃদয় কাঁদে। তুমি কেন এমনি করে বিপ্লবদলে যোগ দিয়ে নিজের অমূল্য প্রাণ নষ্ট করছ? রামপ্রসাদ হিন্দু, ভারতে ইংরেজ রাজত্বের বদলে হিন্দু রাজত্ব স্থাপন করাই তার উদ্দেশ্য। শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশে তোমার জন্ম, তুমি কেন কাফেরের সঙ্গে যোগ দিয়ে স্বধর্ম ও স্বজাতির বিরুদ্ধাচরণ করছ?" কিন্তু আসফাক স্বদেশ সেবাকেই চরম ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, ধর্মের ছদ্মনামে যে সাম্প্রদায়িক প্রবৃত্তি মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে অন্ধ করিয়া দিবার জন্য মানুষের হৃদয়ে বিরাজ করিয়া থাকে আসফাকের হৃদয়ে তাহার স্ফুলিঙ্গ মাত্রও অবশিষ্ট ছিল না। তাই বাতাস পাইয়াও সেখানে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলিয়া উঠিতে পারিল না। আসফাক দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল, খাঁ সাহেব, আপনার এই সদিচ্ছার জন্য আপনাকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু আমার মত পরিবর্তন হবে না। পণ্ডিত রামপ্রসাদ হিন্দু নন, তিনি

হিন্দুস্থানী ; হিন্দুর স্বাধীনতা নয়, হিন্দুস্থানের স্বাধীনতাই তাহার কাম্য। কিন্তু যদি হিন্দুর স্বাধীনতাও তাহার কাম্য হ'ত, তবু আমি তার সঙ্গে যোগ দিতে দ্বিধা করতাম না। ইংরাজের বুটের তলায় চিৎ হয়ে শুয়ে দিন কাটানর চাইতে ভারতবাসী হিন্দুর অধীনে বাস করা আমি শ্রেয় বলে বিবেচনা করি।" খাঁ সাহেবের চালাকি টিকিল না, পরীক্ষার আগুনে দগ্ধ হইয়া আসফাক বরং খাটি সোণা হইয়াই বাহির হইয়া আসিলেন।

ইতিমধ্যে কাকোরী মামলার অপর পলাতক আসামী শ্রীশচীন্দ্রনাথ বক্সীকে ভাগলপুরে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। আসফাক ও শচীন্দ্রনাথের বিচার এক সঙ্গেই হইল। ষড়যন্ত্র মামলায় একজনের অপরাধে সকল-কেই দোষী বলিয়া গণ্য করা হয়। তাই রামপ্রসাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে যে স্তূপীকৃত প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছিল তাহারই বলে স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট আসফাক ও শচীন্দ্রনাথ উভয়কেই দায়রায় সোপর্দ করিলেন। যথা সময়ে দায়রা আদালতে বিচারও শেষ হইল। আসফাক শুনিতে পাইলেন আইন তাহার জন্য মৃত্যুদণ্ড নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে।

বিচারের সব অভিনয় শেষ হইয়া গেলে রামপ্রসাদের মত আসফাকও দয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই দয়া প্রার্থনার মধ্যে পবিত্র প্রেমের যে করুণ কাহিনী লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহা মনে করিলে কাহারও চক্ষু অশ্রুসজল না হইয়া থাকিতে পারে না। রামপ্রসাদ আসফাককে ভাল-বাসিতেন, হৃদয়ের সমস্তটুকু দিয়াই ভালবাসিতেন। হৃদয়ের সমস্ত ভাব ভালবাসার পাত্রকে না শুনাইতে পারিলে মানুষের প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠে। রামপ্রসাদ যখন বিপ্লববাদ বিশ্বাস করিতেন তখন তিনি আস-ফাককে বিপ্লবমন্ত্রেই দীক্ষা দান করিয়াছিলেন। কারাজীবনের শেষ ভাগে তিনি যখন নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া নিজের রাজনৈতিক মত

পরিবর্তন করিলেন তখন তিনি আপনার আন্তরিক সুহৃদ আসফাককে আবার নূতন মন্ত্রে দীক্ষা দিতেই চেষ্টা করিলেন। আসফাক রাম-প্রসাদকে আপনার বন্ধু ও গুরু বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিপ্লব-দলের অবশ্য পালনীয় নীতি অনুসারে তিনি গুরু রামপ্রসাদের হাতে আপনার যথাসর্বস্ব সমর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের রাধা বলিয়াছিলেন, "সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত, ভাল মন্দ নাহি জানি ," রামপ্রসাদের মুখ হইতে নূতন বাণী শুনিয়া আজ আসফাক উল্লাও সেই কথাই পুনরুচ্চারণ করিলেন। ফলাফলের সমস্ত দায়িত্ব তাহারই হাতে দিয়া আসফাক স্বচ্ছন্দচিত্তে দয়াপ্রার্থনাপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। এই দয়া প্রার্থনার ফল কি হইয়াছিল তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এইরূপ দয়া প্রার্থনার ঔচিত্যানুচিত্য সম্বন্ধে রামপ্রসাদের জীবনকাহিনী বলিতে যাইয়া আমরা যাহা বলিয়াছি, আসফাক উল্লার দয়া প্রার্থনা সম্বন্ধেও আমরা তাহাই বলিব। অধিকন্তু আমাদিগকে এই কথাই বলিতে হইবে যে, ভালবাসার সোনারকাঠির স্পর্শে আসফাক উল্লার দয়া-প্রার্থনা এমনই এক উচ্চস্তরের জিনিসে পরিণত হইয়াছিল যাহাকে সাংসারিক বিচারবুদ্ধির মাপকাঠি দিয়া মাপিতে গেলে তাহার অমর্যাদা করা হয়। আত্ম-সমর্পণ অন্ধ হইলেও যদি পবিত্র ভালবাসা প্রণোদিত হয় তবে তাহা স্বর্গীয়, তাহাকে দাসমনোবৃত্তিসূচক বলিয়া কল্পনা করাও অন্যায়।

(৩)

ফাঁসীর কয়েকদিন আগের কথা। ফৈজাবাদ জেলে আসফাক উল্লা মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন কাটাইতেছিলেন। নির্জন কারাবাস, দিন-রাত্রির অধিকাংশ সময় তিনি কোরাণ পাঠ করিয়া ও ভগবদ্‌চিন্তা করিয়া কালাতিপাত করিতেন। প্রশান্ত মুখমণ্ডলে তাহার চিন্তার রেখাটুকু

পর্যন্ত অঙ্কিত হয় নাই, কিন্তু দেহ কতকটা শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় একদিন জনৈক আত্মীয় তাহার সঙ্গে শেষ দেখা করিতে আসিলেন। দুই জনই দুই জনের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া, বাতায়নের সুদৃঢ় লৌহশলাকাগুলি দুই জনকে পরস্পর হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। আসফাকের শীর্ণ দেহের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার আত্মীয়ের দুই চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। আসফাক মৃদু হাসিয়া তাহাকে বলিলেন, "আপনি ভাবছেন, মরবার ভয়ে আমার শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে। তা নয়। আমি আজকাল খুব কম খাই। দু'দিন পর যার কাছে যাব, আপনাকে তারই গ্রহণযোগ্য করে গড়ে তুলছি। কম খেলে মনঃসংযম করা সহজ।" মৃত্যুপথের পথিকের প্রশান্ত মুখচ্ছবি আর তাহার কণ্ঠের এই নির্ভয় বাণী শুনিয়া তাহার আত্মীয় আর কিছুই বলিতে পারিল না। এমন করিয়া যে আপনাকে বিলাইয়া দিতে পারিয়াছে তাহার জীবনমৃত্যুর ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামাইবার ধৃষ্টতা কাহার থাকিতে পারে!

১৯২৭ সনের ১৯শে ডিসেম্বর ফাঁসী হইবে। ১৮ই ডিসেম্বরের কথা। আসফাক শুনিতে পাইলেন চির জনমের মত একবার শেষ দেখা দেখিবার জন্য এক বন্ধু আসিয়াছে। জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবও দয়া করিয়া অনুমতি দিয়াছেন। আসফাক তাহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য চলিয়া গেলেন। আজ তাহাকে তাহার নিজের কাপড় চোপড় ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাই অনেকদিন পর আসফাক আজ স্নান করিয়া, চুল আচড়াইয়া, পরিষ্কার কাপড় চোপড় পড়িয়া প্রথম হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন। দূর হইতে বন্ধুকে দেখিয়াই তাহার প্রশান্ত মুখমণ্ডল সুবিমল হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে তিনি বন্ধুকে বলিলেন, "কি ভাই, আমাকে তোমার শুভেচ্ছা জানাতে এসেছ? কাল যে

আমার বিয়ে।” বিবাহই বটে। দিকে দিকে নরনারীর কণ্ঠে তাহার সম্বর্ধনার শানাই বাজিয়া উঠিয়াছিল ; চিরজীবনের আকাঙ্ক্ষিতা প্রেয়সী তাহার আজ জয়মাল্য হস্তে অদূরে দণ্ডায়মানা, তাহার রক্তহীন মুখখানির ঘোমটা খুলিয়া ফেলিয়া তুষার-শীতল সুনীল ওষ্ঠদ্বয়ে চুম্বন করিয়া সবটুকু অমৃত রস পান করিয়া লওয়া—কি সে আনন্দ, কি সে তৃপ্তি ! আসফাক সত্য সত্যই বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

পরদিন প্রভাত হইবার পূর্বেই তাহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হইল। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তিনি কোরাণ শরীফ পাঠ করিয়াছিলেন, মরণের প্রাক্কালেও তিনি সেই ধর্মগ্রন্থ পরিত্যাগ করেন নাই। ফাঁসী-মঞ্চে উঠিবার সময় কোরাণশরীফ তাহার কণ্ঠদেশেই আবদ্ধ ছিল।

ফাঁসীকাষ্ঠে উঠিবার পূর্ব্বে কোরাণের পবিত্র মন্ত্রগুলি আর একবার স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিলেন। তারপর অপর কাহারও সাহায্য মাত্র না লইয়া নিজেই ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে সিঁড়ির পর সিঁড়ি বাহিয়া ফাঁসী মঞ্চে আরোহণ করিলেন। এইবার শেষবার সমবেত জনবৃন্দের দিকে চাহিয়া তেমনই ধীর অকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, “আমি ভারত স্বাধীন করবার জন্য চেষ্টা করছিলাম বটে কিন্তু মানুষের রক্তে আমার হাত কলঙ্কিত হয় নাই।” তারপর জল্লাদ তাহার গলায় ফাঁসীর দড়ি পরাইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার অবিনশ্বর আত্মা নশ্বর দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া অমরধামে প্রস্থান করিল।

মৃত্যুকে আসফাক কোন্ চক্ষে দেখিতেন তাহা আমরা তাহার নিজের রচনা হইতেই অনুমান করিয়া লইতে পারি। তিনি কবি ছিলেন, মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে তিনি যে কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহা হইতেই তাহার মনোভাব সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। তিনি লিখিয়া-ছিলেন :—

"ফণা হ্যায় সবকে লিয়ে
হাম প্যায় কুছ নহি মৌকুফ
বকা হ্যায় এক যাকত
জাতে কিব্রিয়াকে লিয়ে
ভঙ্গ আকর হাম্‌ভী
উনকে জুলুমসে বে-দাদসে
চল দিয়ে স্যয়ে, অদম
জিদানে ফয়জাবাদসে ॥"

অর্থাৎ

মৃত্যু! সে ত সকলের জন্যই অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। আমার মৃত্যুও কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয় যে আমি তাহার ভয়ে কাতর হইব? দুনিয়ার সমস্তই নশ্বর, কালক্রমে সকল জিনিসই এক অবিনশ্বর ভগবানে লয় হইয়া যায়; ভগবানের এই অলঙ্ঘ্য বিধান অনুসারে আমিও ফৈজাবাদ পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করিব।

মৃত্যুর পূর্বে দেশবাসীকে লক্ষ্য করিয়া আসফাকউল্লা এক বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমরা তাহারই সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া এই মুসলমান দেশপ্রেমিকের জীবন কাহিনী সমাপ্ত করিব। তিনি লিখিয়াছিলেন, "ভারতের রঙ্গভূমিতে আমার অংশ আমি অভিনয় করিয়া গেলাম। আমি ন্যায় করিয়া থাকি বা অন্যায় করিয়া থাকি, দেশের স্বাধীনতার জন্য করিয়াছি। আমার কাজ সকলে সমর্থন না করিতে পারেন, আমার বীরত্ব ও আমার সাহসের প্রশংসা আমার শত্রুকেও করিতে হইবে। বিপ্লবীর জীবনের যোদ্ধার বীরত্বও বৈদান্তিকের ঔদাসীন্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। স্বদেশের বেদীমূলে সে আপনার সমস্ত বিচার-শক্তিকে বিসর্জন দিতেও ইতস্তত করে না। বিপ্লবীর শত্রুগণ বলিয়া

থাকে যে বিপ্লবী নরহত্যাকারী নিষ্ঠুর, মানুষের প্রাণ হনন করিতে সে বিন্দুমাত্রও ইতস্তত করে না। সরকারী কর্মচারীদিগকে গোপনে কাপুরুষের মত হত্যা করাই তাহার একমাত্র ব্যবসায়। কিন্তু আমি এই উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিতে চাই। এতদিন ধরিয়া আমাদের মোকদ্দমা চলিল কিন্তু কোন সাক্ষী, কোন পুলিশ-কর্মচারী কি সেজন্য নিহত হইয়াছে? না, বিপ্লবীর উদ্দেশ্য সরকারী কর্মচারীদিগকে ভয়াক্রান্ত করা নহে. তাহার উদ্দেশ্য দেশে এক সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল সশস্ত্র বিপ্লব সৃষ্টি করা। বিচারক আমাদিগকে নির্দয়, ডাকাত, নরহত্যাকারী প্রভৃতি অনেক আখ্যায়ই ভূষিত করিয়াছেন। কিন্তু আমি আজ জিজ্ঞাসা করিতে চাই বিচারক কি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের কথা জানেন না? যে নিরস্ত্র অসহায় নর-নারী বালক-বৃদ্ধের উপর অবিচলিতচিত্তে বিনা দোষে গুলী চালাইতে পারে, হত্যাকারী সে, না হত্যাকারী আমরা? ভারতবাসী ভাই সব, তোমরা যে ধর্মাবলম্বীই হওনা কেন, যে সম্প্রদায়ের লোকই হও না কেন, সমস্ত পার্থক্য ভুলিয়া দেশের কাজে আত্মনিয়োগ কর। বৃথা কেন এই সাম্প্রদায়িক কলহ? বৃথা কেন এই রক্তপাত? সব ধর্মই কি এক নয়, হিন্দুর ভগবান আর মুসলমানের আল্লা কি বিভিন্ন? আমাদের মৃত্যু তোমাদের বুকে যদি একটুও বাজিয়া থাকে তাহা হইলে আপনাদের সমস্ত পার্থক্য ভুলিয়া আমলাতন্ত্রের কাছে কি ইহার প্রকৃত প্রতিবিধান দাবী করিবে না? নিজের মৃত্যুর জন্য আমার একটুও দুঃখ নাই, বরং এই ভাবিয়া গর্বে আমার বুক আজ স্ফীত হইয়া উঠিতেছে যে ৭ কোটী ভারতবাসী মুসলমানের মধ্যে দেশের জন্য প্রাণদান করিবার সৌভাগ্য আমারই হইয়াছে সর্বপ্রথম।

আজ আমি বিদায় লইতেছি, কিন্তু বিদায় লইবার পূর্বে বিচারক এবং পুলিশ কর্মচারীদিগকে আমি ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

কেননা তাহাদের কৃপায় আজ আমি এই পরম সৌভাগ্য ও গৌরবের অধিকারী হইতে পারিয়াছি।

মরণের পূর্বে দেশবাসীর প্রতি আমি আমার আন্তরিক অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি, "ভারতবর্ষ স্বাধীন হউক, ভারতবাসী সুখী হউক।"

মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়াইয়া আসফাক উল্লা দেশবাসীকে যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া গিয়াছেন, দেশবাসী, বিশেষ করিয়া দেশের মুসলমান অধিবাসিগণ কি তাহার সে অনুরোধে কর্ণপাত করিবে না? তাহার রক্তদান কি একেবারেই বৃথা যাইবে? আমরা মুসলমান যুবকদিগকে এই প্রশ্নই আজ জিজ্ঞাসা করিতে চাই।

ঠাকুর রোশন সিং

শিক্ষার সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে যাইয়া আমরা আজকাল শিক্ষা জিনিসটাকেই সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি। কতকগুলি পুঁথি মুখস্ত করিয়াই কেহ শিক্ষিত পদবাচ্য হইতে পারে না। চিন্তা-শক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া হৃদয়ের সৎপ্রবৃত্তিগুলিকে যাহা বিকশিত করিয়া দিতে পারে না তাহা অপর যাহাই হউক না কেন, প্রকৃত শিক্ষা নহে। লিখিবার এবং পড়িবার শক্তি এই উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাই শিক্ষার একমাত্র মানদণ্ড হইতে পারে না। নিরক্ষর বর্ণজ্ঞানহীন ব্যক্তিও সহজ সংস্কার এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তি অনুশীলন করিয়া হৃদয়স্থ সৎপ্রবৃত্তিগুলিকে মার্জিত ও কর্মঠ করিয়া তুলিতে পারে এবং,

অবস্থায় উপনীত হইলে তাহার ও সাধারণভাবে শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে মূলত কোনই পার্থক্য থাকে না। ঠাকুর রোশণ সিংকে আমরা এই শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে গণনা করিতে পারি। তিনি ছিলেন ভারতের অগণিত নিরক্ষর শিক্ষিত ব্যক্তিদের অন্যতম প্রধান প্রতিনিধি।

শাহজাহানপুরে নাওয়াদা গ্রামেতাহার জন্ম হইয়াছিল। জাতিতে ছিলেন তিনি রাজপুত। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিদ্যুতালোকশিখা তখন পর্যন্ত সে গ্রামের অধিবাসীদের চক্ষু ঝলসাইয়া দেয় নাই। সে গ্রামের সভ্যতা, সে গ্রামের culture বিজাতীয় সভ্যতার সংস্পর্শে তখন পর্যন্ত কলুষিত হইয়া উঠে নাই। সে গ্রামের আকাশ ভারতের আকাশ, সে গ্রামের বাতাসে ভারত জননীর স্নেহ-শীতল আঁচলের স্পর্শ, গ্রামের চষা মাটীর স্নিগ্ধ মধুর গন্ধে গ্রামবাসীর প্রাণে ভারতীয় ভাবের স্নিগ্ধ মধুর আবেশ জাগাইয়া তোলে। সেখানে চাঁদের বিদ্যুতালোকের সম্মুখে ম্লান হইয়া যায় না, সেখানে নির্ঝরিণীর কলতান বিরাট বাষ্পীয় পোতের ভীম গর্জনের সম্মুখে শঙ্কায় নীরব হয় না, সেখানকার বায়ুমণ্ডল চিমনীর ধূমে বিষাক্ত হইয়া উঠে না, সেখানকার আকাশ নীল, বাতাস নির্মল, সেখানকার পাকা ধানের গন্ধ-বওয়া হাওয়ার হিল্লোলে, নির্ঝরিণীর চটুল নৃত্যছন্দে, বিহঙ্গের কাকলীমুখর বনানীর মর্মর তানে গ্রামবাসীর হৃদয়ে পুলকের শিহরণ বহিয়া যায়, সেখানকার পারিপার্শ্বিক সমস্ত অবস্থা অধিবাসীদিগকে ভারতীয়ভাবে বিভোর করিয়া তোলে, ভারতীয় সভ্যতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বৈদেশিকতার স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যায় না।

এ গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল রাজপুত, রোশণ সিংও তাহাই। প্রতাপ পৃথ্বিরাজের রক্ত তাহাদের শিরায়, শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত হইত। গ্রামবাসীদিগের সুস্থ সবল দেহ-গুলিতে বিলাসিতার কীট প্রবেশ করিয়া অকালে দূষিত করিয়া তুলিতে

পারিত না। দেহের স্বাস্থ্য, ক্ষেতের ধান, গোয়ালের দুধ, নদীর জল আর বিহঙ্গের কল-সঙ্গীতে তৃপ্ত হইয়া তাহারা স্বাধীন উন্মুক্ত জীবন যাপন করিত। দাসত্ব তাহাদিগকে করিতে হইত না, দাসত্বকে তাহারা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে ঘৃণা করিত।

রাজপুতের বংশে রাজপুতের সমস্ত গুণ লইয়াই রোশণ সিংএর জন্ম হইয়াছিল। নওয়াদা গ্রামে বিদ্যালয় ছিল না, তাই পুঁথি মুখস্ত করিয়া শিক্ষিত হইবার সুবিধা সে পায় নাই। কিন্তু অন্য সমস্ত শিক্ষাই তাহার প্রচুর পরিমাণে লাভ হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই শরীর চর্চা করিয়া ঠাকুর সাহেব অসাধারণ শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যাহা সকল দেশে সকল বীরের যাহা বৈশিষ্ট্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিয়াছে ঠাকুর সাহেব স্বভাবতঃই তাহার অধিকারী ছিলেন। বাল্যে সমবয়স্ক সমস্ত বালকের তিনি ছিলেন মোড়ল। তাঁহার অঙ্গুলীসঙ্কেতে এই বালকদল অসাধ্য সাধন করিতে অগ্রসর হইত। লাঠি, অসি এবং বন্দুক চালাইতে তাহার সমকক্ষ বড় কাহাকেও আশে পাশে পাওয়া যাইত না। সমবয়স্ক বালকদলকে লইয়া শীকার করিতে বাহির হওয়াই ছিল তাহার প্রিয়তম ক্রীড়া। ঠাকুর সাহেব দলের সরদার ছিলেন বটে, কিন্তু গুণ্ডার দলের সর্দার ছিলেন না। তাহার পরম শত্রুও তাহার নামে কোন দুর্ণাম রটাইবার সুবিধা পাইত না। তাহার ক্রীড়াশক্তি অন্য সমস্ত প্রকার আসক্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলিবার সুবিধা পায় নাই। নিজের মনের উপর তাহার অসাধারণ কর্তৃত্ব ছিল, আর ছিল শিখিবার ও জানিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। তাই গ্রামে লেখাপড়া শিখিবার কোন সুবিধা না থাকিলেও তিনি নিজের চেষ্টায় বাল্যকালেই উর্দু ও হিন্দী ভাষা আয়ত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরিণত বয়সে ইংরাজী ভাষাও সাধারণভাবে তাহার আয়ত্বাধীন হইয়াছিল এবং জেলে থাকিবার সময়

মরণের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়াও তিনি বাঙালী সহকর্মীদের নিকট বাংলা ভাষা শিখিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন।

বাল্যে ঠাকুরসাহেবের অপর একটি বিশেষত্ব ছিল প্রগাঢ় ধর্মানুরাগ। ধর্মমতে তিনি ছিলেন আর্য-সমাজীয়। এ সমাজের সংকীর্ণতা তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে নাই কিন্তু এই ধর্মমতের সমস্ত প্রগাঢ়তা ও ঐকান্তিকতা তাঁহার জীবন-যাত্রা-প্রণালীর অংশ-বিশেষে পরিণত হইয়াছিল। উপাসনা ও পূজা-অর্চনায় তাঁহার প্রগাঢ় আসক্তি পরিলক্ষিত হইত। বস্তুতঃ প্রকৃত ধর্মানুরাগ না থাকিলে কেহই বোধ হয় বিপ্লবী হইতে পারে না। একটা ঐকান্তিক আত্ম-সমর্পণের ভাব না থাকিলে বিপ্লবীর দুর্গম জীবনযাত্রার পথে কেহই বোধ হয় অস্খলিত পদে আদর্শের উদ্দেশ্যে ঝড়ঝঞ্ঝাবজ্রপাত মাথায় করিয়া হাসিমুখে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি অতিক্রম করিতে পারে না। ঠাকুর রোশণ সিংএর ধর্ম্মানুরাগ কথার কথা ছিল না, তাহার ধর্মাচরণ কেবল গতানুগতিককে অনুসরণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। তাহার ধর্ম তাহার জীবনকে প্রভাবান্বিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বন্যা যখন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দুর্জয় বেগে চলিয়াছিল ঠাকুরসাহেব তখন সে স্রোতের টান হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই, বোধ হয় চেষ্টাও করেন নাই। মহাত্মা গান্ধীর কম্বুকণ্ঠের শঙ্খনিনাদ কেবল তাঁহার কানে প্রবেশ করে নাই, কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পর্যন্ত আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। তাই সে দিনের সে আহ্বান তাঁহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া সেই যে পথে দাঁড় করাইয়া দিয়াছিল, তাহার পর আর তাঁহার ঘরে ফিরিয়া যাওয়া হয় নাই। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ঠাকুরসাহেব কংগ্রেস-কর্মী

হিসাবে যুক্ত-প্রদেশের অনেক স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এই শক্তিশালী আন্দোলনকে পিষিয়া মারিবার জন্য সরকার যে দমননীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার প্রকোপ হইতে অন্যান্য কংগ্রেস-কর্মীর মত ঠাকুরসাহেবও নিস্তার পান নাই। দেশবাসীকে মুক্তিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিবার অপরাধে তাঁহাকে দুই বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল।

ঠাকুরসাহেব যখন কারাগার হইতে বাহির হইয়া আসিলেন তখন অসহযোগ আন্দোলন থামিয়া গিয়াছে। দেশব্যাপী অবসাদের ঢেউ তখন তাঁহারও প্রাণে আসিয়া লাগিল। চারিদিকে নৈরাশ্যের অন্ধকার—সম্মুখে কোন কার্যপদ্ধতি নাই, থাকিলেও সে পদ্ধতি অনুসারে কাজ করাইবার নেতা নাই। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া তিনি যখন কোন্ পথে যাইবেন স্থির করিতে পারিতেছিলেন না তখন রামপ্রসাদ আসিয়া তাহাকে শুনাইলেন, "সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" গীতায় ভগবানের এই মহাবাক্য ঠাকুরসাহেব পূর্বে অনেকবার পাঠ করিয়াছিলেন কিন্তু আজ রামপ্রাদের মুখে নূতন করিয়া ইহাই শুনিয়া ইহার প্রকৃত অর্থ তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। তাঁহার মনে হইল দেশ-সেবাকে যদি ভগবানের সেবা বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি তাহা হইলে পন্থা বিচার করিতে যাইয়া ব্রত ত্যাগ করিব কেন? পন্থাকে দেশের উপরে স্থান দেওয়া দেশ-সেবার পরিপন্থী নয় কি? অসহযোগ আন্দোলনে আমি অসহযোগ আন্দোলনের জন্যই যোগদান করি নাই, দেশ-সেবার সহায়ক পন্থা বলিয়াই যোগদান করিয়াছি। আর আজ সেই আন্দোলনের স্রোত বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়াই কি আমার সমস্ত কর্মশক্তিকে বদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে? তাহার প্র ণ তাহাকে বুঝাইল যে, পন্থার ঔচিত্যানুচিত্য বিচার না

করিয়া কেবলমাত্র সেবার আদর্শটুকুকে সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হওয়াই নিষ্কাম স্বদেশপ্রেমিকের কর্তব্য। ঠাকুরসাহেব অন্তরের এ নির্দেশ অবহেলা করিতে পারিলেন না। রামপ্রসাদের নেতৃত্ব সানন্দে স্বীকার করিয়া লইয়া ইনি বিপ্লবদলে যোগদান করিলেন।

রামপ্রসাদ, ঠাকুরসাহেবকে কেবলমাত্র সংগঠন কার্যের জন্যই নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ট্রেণ ডাকাতির জন্য দল হইতে তাঁহাকে ডাকা হয় নাই, তিনিও তাহাতে কোন অংশই গ্রহণ করেন নাই। তথাপি একদিন প্রত্যুষে উঠিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার বাসগৃহের চারিদিকে সশস্ত্র পুলিশের ছড়াছড়ি। তাঁহার গৃহ, তাঁহার তৈজসপত্র, তাঁহার বাক্স পেঁটরা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইল। কি মিলিল তাহা কেবলমাত্র পুলিশই জানিতে পারিল। অথচ অনুসন্ধান শেষে পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইতে ছাড়িল না। আদালতে আসিয়া তিনি শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, ডাকাতি এবং নর-হত্যার অভিযোগ। ট্রেণ-ডাকাতি সম্বন্ধে তাহার বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ হইল না। কিন্তু অপর একটি ডাকাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিবার দায়ে বিচারক তাহাকে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। ঠাকুরসাহেবের প্রাণ ছিল, সরকার তাহা জানিতেন। তাঁহার শক্তি ছিল, এ কথাও সরকারের অবিদিত ছিল না। আর সবার উপরে তিনি বিপ্লবদলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ইংরাজের আদালতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবার জন্য ইহা অপেক্ষাও গুরুতর অভিযোগ থাকিবার প্রয়োজন আছে কি?

ঠাকুরসাহেবের দৈহিক ও মানসিক শক্তি ছিল অতুলনীয়। শারীরিক ক্লেশকে তিনি ভ্রুক্ষেপও করিতেন না, মানসিক ক্লেশে কোন দিনই তাহার চিত্ত চঞ্চল হয় নাই। পাহাড়-প্রমাণ দুঃখ-কষ্টের ঢেউ তাহার বীর হৃদয়ে প্রত্যাহত হইয়া ফিরিয়া যাইত। কারাবাসকালে

তিনি যে অপূর্ব আত্ম-সংযম ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা মনে করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। লক্ষ্ণৌ জেলে কর্তৃপক্ষের পাশবিক আচরণের প্রতিবাদকল্পে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ যখন অনশন-ব্রত অবলম্বন করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন তখন ঠাকুরসাহেব সানন্দে সম্মতি প্রদান করেন। তাঁহার দৃঢ়তা, তাঁহার 'কষ্টসহিষ্ণুতা, তাঁহার সুখদুঃখে ঔদাসিন্য দিনের পর দিন অপেক্ষাকৃত দুর্বলহৃদয় সত্যাগ্রহীদের প্রাণে শক্তি ও সাহস সঞ্চার করিত। দুই-এক দিনের মধ্যেই অধিকাংশ সত্যাগ্রহী অনাহারে দুর্বল হইয়া শয্যাশ্রয় করিয়াছিলেন, জেল কর্তৃপক্ষ আপনাদের প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে জোর করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে আহার করাইত। কিন্তু ঠাকুরসাহেব এক দিন নয়, দুই দিন নয়, সুদীর্ঘ পনর দিন কেবল মাত্র জল পান করিয়া দিব্য সাধারণ লোকের মতই সমস্ত কাজকর্ম করিয়াছিলেন। তাঁহার নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মে সামান্যমাত্রও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে পারে নাই। ডাক্তারগণ তাঁহার এই অসম্ভব আত্মসংযম দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতেন, তাঁহার সহকর্মীগণ এই বিরাট সহনশীলতার আদর্শকে সম্মুখে বিচরণ করিতে দেখিয়া দুর্বল প্রাণে শক্তিসঞ্চার অনুভব করিত। বলিতে কি, এই সুদীর্ঘ অনশন কালের মধ্যে নবাগত কেহ তাঁহাকে দেখিয়া অনুমান করিতে পারিত না যে, এই লোকটি দিনের পর দিন কেবল মাত্র জল পান করিয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, বিপ্লববাদী ও বেদান্তবাদীর মধ্যে মূলতঃ কোনই পার্থক্য নাই। বিপ্লববাদী বেদান্ত মুখস্ত না করিয়াও সাংসারিক সমস্ত সুখ-দুঃখকে মনের বিকার মাত্র বলিয়া অনুভব করিতে শিক্ষা করে। ঠাকুরসাহেবের জীবনের একটি ঘটনা হইতে এই কথার সত্যাসত্য আরও সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে। তিনি যখন জেলে ছিলেন

সেই সময়েই আহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। জেল-কর্তৃপক্ষের এক জন লোক যখন এই নিদারুণ দুঃসংবাদ তাহার নিকট বহন করিয়া লইয়া আসিলেন তখন তিনি কারাগৃহের এক নির্জন প্রান্তে বসিয়া বাঙলা ভাষায় লিখিত একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। সংবাদবাহী কর্মচারী প্রথমে কতকটা ইতস্তত কবিয়া তারপর নিতান্ত সংক্ষেপে তাহাকে সমস্ত সংবাদ শুনাইয়া দিলেন। ঠাকুর সাহেবের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া উঠিল কিন্তু সে মুহূর্ত-মাত্রের জন্য। তাঁহার বৈদান্তিক প্রাণের মূল তন্ত্রীটি তখনই ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, জন্ম ও মৃত্যু একই জিনিসের দুই বিভিন্ন রূপ বই ত নয়। পিতার মৃত্যু-সংবাদে তুমি বিচলিত হইবে কেন? মুহূর্ত মধ্যে এই তরুণ ঋষি আত্মকর্তৃত্ব ফিরিয়া পাইলেন, মুখ হইতে বাহির হইল কেবল তিনটি শব্দ "ওঁ তৎ সৎ"। মানব হৃদয়ের সহজ সংস্কার বশত যে দুই ফোটা অশ্রু চোখ ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতে-ছিল তাহা মধ্যপথে বাষ্প হইয়া উড়িয়া গেল।

অপরের সম্বন্ধে তাঁহার এই ঔদাসীন্য যে হৃদয়হীনতার নামান্তরমাত্র ছিল না, তাঁহার আপনার প্রতি ঔদাসীন্য লক্ষ্য করিলে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। আদালতে যখন তাঁহার জীবনমরণের কথা লইয়া আলোচনা চলিতেছিল তখনও নিমেষের জন্য কেহ তাঁহার মুখভাবে শঙ্কা বা উদ্বেগের চিহ্ন লক্ষ্য করে নাই; ফাঁসীর আজ্ঞা শুনিয়াও তাঁহার মুখভাবের কোনও পরিবর্তন হয় নাই। তাঁহার শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণ দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নাই। তাই চীফকোর্ট ও প্রীভিকাউন্সিলে আপীল করিয়া তাহারা এই তরুণ সন্ন্যাসীর প্রাণরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ঠাকুর সাহেব কিন্তু প্রাণ লইবার চেষ্টা ও প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা একই ঔদাসীন্যের সঙ্গে উপেক্ষা করিয়া চলিতেন। বন্ধুগণের অনুরোধে তিনি যখন ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন

তখনও তাঁহার মনোভাবের বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন হয় নাই। প্রাণের আশা তিনি কোন দিনই করেন নাই, তাই প্রাণ বাঁচাইবার শেষ চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া গেলেও নৈরাশ্য আসিয়া তাঁহার অন্তরকে অভিভূত করিতে পারে নাই। লেখাপড়া ও ভগবৎ আরাধনার ভিতর দিয়া তিনি আসন্ন-মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

চীফকোর্টের রায় বাহির হইবার অব্যবহিত পরেই সহকর্মীদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে এলাহাবাদ জেলে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এবং সেখানেই তাঁহার ফাঁসী হয়। সাংসারিক সুখ-দুঃখের প্রতি যে ঔদাসীন্য তাঁহার আজীবনের বৈশিষ্ট্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল, জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে, ফাঁসী কাষ্ঠের নীচে দাঁড়াইয়াও তিনি সে বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিপ্লবীর চির-সহচর শ্রীমদ্ভা-গবদ্গীতা শেষ পর্যন্ত তিনি হস্তচ্যুত হইতে দেন নাই। ফাঁসীর পূর্ব রাত্রিতে শ্রীভগবানের মুখ-নিসৃত অমৃতরস পান করিয়া তিনি নিজের প্রাণকে নূতন শক্তিতে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাই প্রভাতের আলো দিক্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িবার পূর্বেই জল্লাদ আসিয়া যখন তাঁহার গৃহের দ্বার খুলিয়া দিল তখন চিরসহচর গীতাখানি হাতে লইয়া অচঞ্চল চিত্তে, অকম্পিত পদক্ষেপে তিনি কারাকক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ফাঁসীকাষ্ঠে আরোহণ করিবার সময়ও তাহার হৃদয় কাঁপিল না। জল্লাদ তাঁহার গলদেশে ফাঁসীর দড়ি পড়াইল, ঠাকুর সাহেব এ জীবনের মত শেষবার বলিয়া উঠিলেন, "বন্দেমাতরম্।" সে কণ্ঠস্বর কি গম্ভীর, কি ভক্তি ও ভাবের আবেগে পরিপূর্ণ। সে আবেগকম্পিত কণ্ঠের ব্যাকুল আহ্বানে ভারতের ঘরে ঘরে জননীর হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু আইনের হৃদয়ে ভাবান্তর উপস্থিত হইল না, কারাধ্যক্ষের পাষাণ হৃদয়ের দ্বারে আহত হইয়া তাহা ফিরিয়া আসিল। মুহূর্ত-মধ্যে

ঠাকুরসাহেবের দাঁড়াইবার অবলম্বনটুকু জল্লাদের কঠোর হস্তস্পর্শে পদতল হইতে সরিয়া গেল। কেবল এক মুহূর্তের জন্য এলাহাবাদ জেলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঠাকুরসাহেবের মুখের শেষ উচ্চারিত বাণী "ওঁ" শব্দের প্রতিধ্বনি ঘুরিয়া বেড়াইল। তারপর সব নিস্তব্ধ। প্রভাত-সূর্যের ঈষদ্‌প্ত কিরণজাল ৩৭ বৎসর বয়স্ক এই "অশিক্ষিত" গ্রাম্য যুবকের মুক্ত আত্মাকে নব-জীবনের রসে সঞ্জীবিত করিয়া অমরধামে বহন করিয়া লইয়া গেল।

ঠাকুরসাহেবের আত্মীয়গণ বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহাদের বড় আশা ছিল যে জীবনে যাহার অদৃষ্টে কোথাও কোন অভ্যর্থনা মিলে নাই, মরণে আজ সে দেশবাসীর শ্রদ্ধাঞ্জলি পাইবে। কিন্তু তাঁহার জীবনের চিরশত্রু সরকার বাহাদুর মরণেও তাহার শত্রুতা করিতে বিরত হইলেন না। আদেশ হইল শোভাযাত্রা করিয়া শব লইয়া যাওয়া হইতে পারিবে না। তাই জনতাকে নিরাশ করিয়া ফিরাইয়া দিতে হইল। নিতান্ত সাধারণভাবে আর্যসমাজের পদ্ধতি অনুসারে ঠাকুরসাহেবের আত্মীয়গণ গঙ্গাতীরে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। সহজ অনাড়ম্বর জীবন-নাটকের যবনিকা নিতান্ত আড়ম্বরহীন ভাবেই পতিত হইল।

কেমন করিয়া, কোন্ শক্তিতে শক্তিমান হইয়া ঠাকুরসাহেব মৃত্যুকে অত সহজভাবে বরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার স্বলিখিত এক পত্র হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। এই পত্র ফাঁসীর এক সপ্তাহ-পূর্বে তিনি নিজের এক বন্ধুর নিকট লিখিয়াছিলেন। জেল-কর্তৃপক্ষ ইহার অনেক অংশ কাটিয়া দিয়াছেন, বিশেষত যে অংশগুলিতে তিনি রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন। তাই কেমন করিয়া মরণের দ্বারে দাঁড়াইয়াও তাঁহার দরদী প্রাণ দেশের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া

আকুল হইতেছিল তাহার জীবন্ত ছবিখানি আমরা পাঠকদিগকে উপহার দিতে পারিতেছি না তথাপি এই পত্রখানি হইতে তাহার অন্তরের ভাবগুলি সম্বন্ধে পাঠক একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লইতে পারিবেন। পত্রখানি হিন্দীতে লিখা হইয়াছিল, আমরা তাহার যথাসম্ভব খাঁটী বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতে চেষ্টা করিব। তিনি লিখিয়াছিলেন, "এক সপ্তাহের মধ্যেই ফাঁসীকাষ্ঠে সব শেষ হইয়া যাবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমার প্রাণঢালা প্রেমের প্রতিদান তুমি যেন তাঁর কাছ থেকেই পাও। আমার জন্য দুঃখ করো না, বন্ধু! আমি সানন্দেই মৃত্যুকে বরণ করতে যাচ্ছি। মরণের করাল গ্রাস থেকে কেউ বাঁচতে পারে না। শেষ দিন পর্যন্ত ঈশ্বরের নাম জপ করে জীবনের পবিত্রতা বজায় রেখে মরতে পারলে আর চাই কি? ভগবানের আশীর্বাদে আমি এ দুইটি সাধনায়ই কৃতকার্য হতে পেরেছি। আমার মৃত্যুতে তাই কারও দুঃখিত হবার কোন কারণ নেই। প্রায় দু'বৎসর হতে চ'ললো আমি ছেলে-মেয়েদের ছেড়ে দূরে বাস কর্চ্ছি। তাই আসক্তির বন্ধন আমার কেটে গেছে। এই দু'বৎসর কাল ভগবানের ধ্যান করবার যথেষ্ট সুবিধা পেয়েছি। সময়ের অভাব হয় নাই, সে সময়ের সদ্ব্যবহারও করতে পেরেছি। মোহ আমার কেটে গেছে, বাসনার আগুন আর এ হৃদয়ে জ্বলতে পায় না। বন্ধু, আজ এক অভূতপূর্ব তৃপ্তিতে আমার সমস্ত হৃদয়খানি ভরে উঠেছে। আমার প্রাণ বলছে যে, এই দুঃখকষ্টময় জীবনের লীলা সাঙ্গ করে আমি আনন্দময়ের আনন্দধামে যাবার আয়োজন করেছি। আমার শাস্ত্র বলে যে, ধর্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করলে পরকালে অক্ষয়স্বর্গ লাভ হয়। ধর্মযোদ্ধা আর বনবাসী তপস্বীর মধ্যে মূলত কোনই পার্থক্য নাই।.........তবে আজ আসি। আমার ভালবাসা নিও।"

এই পত্রখানির প্রত্যেকটি বাক্যে ও প্রত্যেকটি ছত্রে যে নির্মল হৃদয়ের

ছবিখানি ফুটিয়া উঠিতেছে তাহার সৌম্য গম্ভীর মূর্তিখানির সম্মুখে শিক্ষাভিমানীই হউক আর ধর্মাভিমানীই হউক—সকলের মস্তকই কি সম্ভ্রমে নত হইয়া পড়িবে না?

রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

কাকোরীর ডাকাতি সম্পর্কে ১৯২৫ সনের ২৬শে সেপ্টেম্বর যুক্তপ্রদেশের পুলিশ যখন রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা লইয়া তাহার কাশীর বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে ব্যস্ত রাজেন্দ্রনাথ তখন কলিকাতা দক্ষিণেশ্বরের এক বাড়ীতে বসিয়া গোপনে বোমা প্রস্তুতপ্রণালী শিক্ষা করিতেছিলেন। যুক্ত-প্রদেশের সংগঠনকার্য মোটামুটি রকমে কৃতকার্যতার সহিতই সংসাধিত হইয়াছে, ট্রেণ-ডাকাতির পর হাতে কিছু অর্থও হইয়াছে, অভাবের আর তেমন তাড়না নাই। তাই রাজেন্দ্রনাথ তখন কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াই অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের দিকে মনোযোগ দিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে বোমাপ্রস্তুতপ্রণালী ভাল করিয়া শিখিয়া লইয়া যুক্তপ্রদেশের কোথাও একটি কারখানা খুলিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার সঙ্কল্প। কিন্তু তাঁহার বড় আশায় বাজ পড়িল। পরদিন খবরের কাগজ খুলিতেই দিবালোকের মত সমস্ত কথা স্পষ্ট হইয়া তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। রাজেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সঙ্গিগণ সকলেই ধরা পড়িয়াছে; এখন যুক্তপ্রদেশে ফিরিয়া গেলে সাধ করিয়া পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণ করা হইবে মাত্র। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অনেকের

সঙ্গে পরামর্শ করিয়া অবশেষে তিনি দক্ষিণেশ্বরেই আরও কিছুদিন গা ঢাকা দিয়া থাকিতে মনস্থ করিলেন।

বাঙলাদেশের কয়েকজন বিপ্লববাদী সমস্ত ভারতের বিপ্লববাদীদের জন্য বোমা সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে দক্ষিণেশ্বরে একটি কারখানা খুলিয়াছিলেন। কিন্তু এ হতভাগ্য দেশে টিকটিকির চক্ষু এড়াইয়া বেশী দিন কোন ষড়যন্ত্রমূলক কাজ চালাইবার সুবিধা হয় নাই, এবারেও হইল না। কলিকাতার গোয়েন্দাবিভাগ এই গুপ্ত কারখানাটির সন্ধান পাইল: ফলে ১৯২৫ সনের ১০ই নবেম্বর এ বাড়ীতে পুলিশের হানা পড়িল। অনেক কাগজপত্র ও বিস্ফোরক পদার্থের সঙ্গে এখানকার সকলেই ধরা পড়িলেন। যুক্তপ্রদেশের পুলিশ সবিস্ময়ে শুনিতে পাইল যে, এত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও যাহার সন্ধান তাহারা এত দিনের মধ্যেও পায় নাই সে দিব্য নিশ্চিন্ত মনে কলিকাতায় বসিয়া গুপ্তপুলিশ কর্মচারীদের মৃত্যুবাণ প্রস্তুত করিতেছিল।

তারপর স্পেশাল ট্রিবিউনাল বসিল, সাক্ষী-সাবুদ আসিল, উকীল আসিলেন, ব্যারিষ্টার আসিলেন, অনেক হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি ও বাকবিতণ্ডার পর ধর্মাবতার মোকদ্দমার রায় প্রকাশ করিলেন। রাজেন্দ্র নাথ দশ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। কিন্তু তাহার মাথার উপর অপর একটি গুরুতর ষড়যন্ত্রের মামলা খাড়ার মতন ঝুলিয়া আছে। তাই তাঁহাকে তাহার দণ্ডভোগ করিবার অবসরও দেওয়া হইল না। যাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিবার উদ্দেশ্যে রাজেন্দ্রনাথ কলিকাতায় বোমাপ্রস্তুতপ্রণালী শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, পুলিশের কৃপায় তিনি লক্ষ্ণৌ আসিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিবার সুবিধা পাইলেন। তাহার পর যাহা হইল তাহার ইতিহাস আমরা ইতিপূর্বেই সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছি।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে পাবনা জিলার ভরেঙ্গা গ্রামে মাতুলালয়ে রাজেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। এই জিলারই মোহনপুর গ্রামে তাহার পিত্রালয়। তাহার পিতা ক্ষীতিমোহন লাহিড়ী নিজ গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। কথায় বলে পিতার দোষগুণ পুত্রে বর্তিয়া থাকে। কার্যতঃ দেখা যায় যে পিতার গুণের অধিকারী না হইলেও পুত্রমাত্রই পিতার দোষগুলির ষোল আনা অধিকারী হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু রাজেন্দ্রনাথ পিতার সমস্ত সদ্গুণের অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্ষীতিমোহন প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন; তাহার উপর স্বীয় ঔদার্য্য সহৃদয়তা ও লোকসেবা দ্বারা তিনি সমস্ত জেলাবাসীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল স্রোতে যখন বাংলাদেশ ডুবিয়া ভাসিয়া গিয়াছিল ক্ষীতিমোহনও সে স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিতে ইতস্তত করেন নাই। এবং ইহারই ফলে বাংলা পুলিশের সতর্ক সস্নেহ দৃষ্টি তাহার, তথা তাহার পরিবারস্থ সকলের উপরেই পতিত হইয়াছিল। সে দৃষ্টি আজ পর্যন্তও অপসারিত হয় নাই, বরং রাজেন্দ্রনাথের ফাঁসীর পর হইতে সে স্নেহের প্রগাঢ়তা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ক্ষীতিমোহনের বদান্যতা দেশপ্রসিদ্ধ ছিল। দুঃস্থের দুঃখ দেখিলে তাঁহার কোমল হৃদয় স্বভাবতঃই কাঁদিয়া উঠিত। বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ে অভাবের অন্ত নাই। ম্যালেরিয়ার সেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত; সুপেয় পানীয় জল কাহাকে বলে তাহা সেখানকার লোক বড় একটা জানিবার অবসর পায় না; মা সরস্বতী বোধ হয় সপত্নীর শত্রুতা ভুলিয়া লক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গেই পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া সহরে চলিয়া গিয়াছেন। ক্ষীতিমোহন গ্রামবাসীদের এই সমস্ত দুরবস্থা চক্ষে দেখিয়া অনেক সময়েই গোপনে অশ্রু বিসর্জন করিতেন। সাধ্যমত তিনি ইহার

প্রতীকার করিতে কখনই বিরত হন নাই। মোহনপুর গ্রামের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আজও তাহার কীর্তিস্তম্ভস্বরূপ বর্তমান রহিয়াছে।

এমন পিতার পুত্র রাজেন্দ্রনাথ পিতার সমস্ত সদগুণ লইয়াই জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাল্যে ও যৌবনে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা এই গুণগুলিকে নষ্ট না করিয়া বরং বিকশিত হইবারই সহায়তা করিয়াছিল। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, পিতা শত উদার হইলেও আপনার স্বভাবসুলভ স্বার্থপরতাকে ভুলিতে পারেন না। পুত্রস্নেহে অন্ধ হইয়া অনেক সময়েই তিনি পুত্রকে বিপদসঙ্কুল কর্তব্যপথ হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে রাজেন্দ্রনাথ কতকগুলি বিশেষ সুবিধা উপভোগ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। বাল্য ও যৌবনের অধিকাংশ সময়ই তাহাকে পিতার নিকট হইতে দূরে বাস করিতে হইয়াছিল। ফলে পিতার সমস্ত স্নেহটুকু উপভোগ করিবারই তাহার সুবিধা হইয়াছিল, পিতৃহৃদয়ের দুর্বলতাদ্বারা অভিভূত হইবার আশঙ্কা কোন দিনই তাহার হয় নাই।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রনাথ বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন এবং যথাক্রমে আই এ ও বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইতিহাসে ও অর্থশাস্ত্রের প্রতি রাজেন্দ্রনাথের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। আই এ ও বি এ পরীক্ষায় তিনি এই উভয় বিষয় লইয়াই উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং ইতিহাসে এম এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। অর্থশাস্ত্রের প্রতি সত্য সত্যই তাহার একটা আন্তরিক অনুরাগ ছিল। তিনি বলিতেন যে, বর্তমান যুগে অর্থশাস্ত্র না জানিলে কাহারও শিক্ষা শিক্ষা নামের যোগ্য হইতে পারে না। নিজের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও সমস্যা সম্বন্ধে যাহার সম্যক কোন ধারণা তাই তাহার পক্ষে 'দেশ দেশ' বলিয়া চীৎকার করা নিতান্তই

নিরর্থক। অর্থশাস্ত্র ও অন্তররাষ্ট্রীয় অবস্থা সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা না থাকিলে কেহই প্রকৃত স্বদেশসেবার যোগ্য হইতে পারে না। রাজেন্দ্র-নাথের পক্ষে ইহা কেবল মুখের কথা ছিল না। নিজে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া জগতের বিভিন্ন দেশের ইতিহাস ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক পড়াশুনা করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতী ছাত্র বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট সুনাম ছিল, তাহার সতীর্থগণ এ কথার সত্যতা স্বীকার করিবেন।

কিন্তু শুষ্ক ইতিহাস ও অর্থশাস্ত্র আলোচনা করিয়া রাজেন্দ্রনাথ নিজে শুষ্ক হইয়া গিয়াছিলেন এমন কথা তাহার পরম শত্রুও বলিতে পারিবে না। কেবল মস্তিষ্ক লইয়া কেহ বিপ্লবী হইতে পারে না; বিপ্লবীর হৃদয় চাই। দেশের দুর্দশার কথা চিন্তা করিয়া যে হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত রক্তের স্রোতাবেগ প্রধাবিত হয় না, সে হৃদয় অপর যাহাই করুক না কেন বিপ্লববাদের দর্শনকে স্বীকার করিয়া লইতে পারে না। রাজেন্দ্র-নাথের হৃদয় ছিল, ব্যারোমিটারের মত। সামান্য আঘাতেই সে হৃদয়ের প্রত্যেকটি তন্ত্রী ঝন্‌ঝন্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিত। তাই একদিকে তিনি যেমন ইতিহাস ও অর্থনীতির সাহায্যে মস্তিষ্কের চর্চা করিতেন, অপর দিকে আবার তেমনই সাহিত্য, সঙ্গীত ও নানাপ্রকার শিল্পকলার আলোচনা দ্বারা হৃদয়ের চর্চা করিতেও তাহার উৎসাহের অভাব পরি-লক্ষিত হইত না। বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় উচ্চশ্রেণীর এমন কোন সাহিত্য পুস্তক ছিল না যাহা রাজেন্দ্রনাথ একাধিকবার পাঠ করেন নাই। সাহিত্যের প্রতি তাহার এইরূপ অসাধারণ অনুরাগ ছিল বলিয়াই তিনি অন্যান্য ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিয়া নিজ গ্রামে জননী বসন্তকুমারীর নামে এক পুস্তকালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। গ্রেপ্তারের অব্যবহিত পূর্বে ইনি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গ সাহিত্য-পরিষদ সভার অবৈতনিক সম্পাদকরূপে

কাজ করিতেছিলেন। এক দিকে তাঁহার যেমন পড়িবার ইচ্ছা ছিল অদম্য, অপর দিকে তেমনই তাঁহার লিখিবার প্রবৃত্তি ও শক্তিও ছিল অসাধারণ। "বঙ্গবাণী", "শঙ্খ" প্রভৃতি বাংলা কাগজে প্রায় নিয়মিত রূপেই তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা বাহির হইত। এতদ্ভিন্ন কাশীতে তিনি 'অগ্রদূত' নামক এক হস্তলিখিত কাগজ পরিচালনা করিতেন। বালক ও যুবক সকলেই যাহাতে বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা করিয়া আপন আপন মনোভাব ভাষায় প্রকাশ কবিতে অভ্যাস করিতে পারে এই উদ্দেশ্যেই তিনি আপনাব 'অগ্রদূত' পবিচালনা করিতেছিলেন। ছেলেদের জন্য এমনই তাহার দরদ ছিল যে, নিতান্ত ছোট ছেলেদেব কাছেও বার বার হাটাহাটি করিয়া, এক রকম হাতে পায়ে ধরিয়াই এই কাগজের জন্য প্রবন্ধাদি সংগ্রহ করিতেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কিছুদিন কাশী স্বাস্থ্য সমিতির সম্পাদকরূপে কাজ করিয়াছিলেন। এক কথায়, লোকহিতকর এমন কোন কার্য ছিল না যাহাতে রাজেন্দ্রনাথ উৎসাহের সহিত যোগদান করেন নাই। স্বাধীন জীবন যাপন করিয়াও লোকে লোকহিতকর কাজের জন্য যাহা করিতে পারে না রাজেন্দ্রনাথ ছাত্রজীবনেই তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী কাজ করিয়াছেন।

আশ্চর্যের বিষয় এইরূপ জনহিতকর প্রত্যেকটি কার্যের জন্যই রাজেন্দ্রনাথকে জবাবদিহি করিতে হইয়াছে এবং সে জবাবদিহি করিতে হইয়াছে নিজের অমূল্য জীবন ফাঁসীকাষ্ঠে উৎসর্গ করিয়া। হিন্দুস্থান রিপাবলিক্যান এ্যাসোসিয়েসনের কার্যক্রম ও নিয়মাবলী শীর্ষক কয়েক খণ্ড কাগজ কাকোরী মামলা সম্পর্কে ধৃত করা হইয়াছিল। ঐ নিয়মাবলীতে সভ্যদিগের কর্তব্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত ছিল যে, প্রত্যেক সভ্য সমস্ত প্রকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিপ্লববাদ

প্রচার করিবে। এই নিয়মটির সূত্র ধরিয়া পণ্ডিত জগৎনারায়ণ বিচারকের কাছে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, রাজেন্দ্রনাথ এই নিয়ম অনুসারেই পাঠাগার, স্বাস্থ্য সমিতি, সাহিত্যপরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া বিপ্লববাদ প্রচার করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। 'হিন্দুস্থান রিপাবলিক্যান এসোসিয়েসন' যে এইরূপ উপায়ে বিপ্লববাদ প্রচার করিতে চেষ্টা করিতেছিল তাহা আমরা অস্বীকার করি না। রাজেন্দ্রনাথ যে এই সমিতির অন্যতম প্রধান সদস্য ছিলেন তাহাও আমরা স্বীকার করি। কিন্তু তিনি এক বিপ্লববাদ প্রচার করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই সমস্ত প্রকার প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন তাহা বলিলে রাজেন্দ্রনাথের বিদ্যানুরাগ ও লোকহিতব্রতের অপমান করা হয়। বিশেষ কোন উদ্দেশ্য লইয়া কেহ কোন প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিলে সে ঐ প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিতে পারে না। হৃদয়ের প্রেরণায় কোন কাজ করিতে যাওয়া আর কর্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায় কোন কাজ করিতে যাওয়া এক কথা নহে। স্বাস্থ্য-সমিতি বা সাহিত্যপরিষদের জন্য রাজেন্দ্রনাথ যেরূপ উৎসাহের সঙ্গে কাজ করিতেন তাহা যাহারা দেখিয়াছেন তাহারা পরম শত্রু হইলেও যদি ন্যায়পরায়ণ হয় তাহা হইলে একথা বলিতে পারিবে না যে, রাজেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র কর্তব্যের খাতিরে অথবা লোক দেখাইবার জন্য অথবা ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উচ্চ কর্মচারীদের আদেশ পালন করিবার জন্যই উহাদের জন্য কাজ করিয়াছেন। রাজেন্দ্রনাথ বিপ্লববাদী ছিলেন সত্য, রাজনৈতিক বিপ্লব সৃষ্টি করাকেই তিনি স্বীয় জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে চরম উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্যও তিনি ভণ্ডামীর প্রশ্রয় দিতে পারেন নাই। সাহিত্যের প্রতি তাহার সত্যসত্যই আন্তরিক অনুরাগ ছিল। সাধারণ ছাত্রদের সকল বিষয়েই অজ্ঞতা দেখিয়া তাহার দরদী প্রাণে সত্য সত্যই ব্যথা

লাগিত। তাই সুযোগ পাইলেই তিনি এই সমস্ত কার্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন, কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নহে।

বিলাসিতাকে রাজেন্দ্রনাথ অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তাঁহার আচার-ব্যবহার ও জীবনযাত্রাপ্রণালীর মধ্যে এমনই একটি সহজ সরলতা ছিল যাহা সকলের চক্ষেই প্রথম দৃষ্টিতে ধরা পড়িত। আজকালকার শিক্ষিত, বিশেষত সাহিত্যের প্রতি অনুরাগবিশিষ্ট যুবকদের মধ্যে এমনই একটা অন্ধ অনুকরণপ্রবৃত্তি লক্ষিত হয় যাহা দেখিলে শিক্ষিত ভদ্র হৃদয়ে আপনা আপনিই একটা বিতৃষ্ণার সঞ্চার হয়। রাজেন্দ্রনাথের মধ্যে কেহ কোনদিনই এইরূপ ভাব লক্ষ্য করে নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাহার অসীম শ্রদ্ধা ছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িতে তিনি সত্য সত্যই ভালবাসিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া কোনদিনই তিনি 'রাবীন্দ্রিক' সাজিতে বসেন নাই। সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার একটা আন্তরিক অনুরাগ ছিল; কিন্তু তাঁহার মুখে একটি দিনের জন্যও অশ্লীল গানের একটি ছত্রও কেহ উচ্চারিত হইতে শোনে নাই। তাহার সরল মধুর ব্যবহার, তাহার চরিত্রের পবিত্রতা, তাহার প্রগাঢ় বন্ধুপ্রীতি, তাহার বৈদান্তিক ঔদাসীন্যের ভাব, তাহার পরিচিত ব্যক্তিমাত্রকেই মুগ্ধ করিত। তাহার সতীর্থদিগের মধ্যে দুই এক জনের সঙ্গে আলাপ করিবার সুবিধা এই লেখকের হইয়াছে। তাহার এই সব বন্ধুর প্রাণে দেশসেবার প্রবৃত্তি বোধ হয় বিন্দুমাত্রও নাই। তথাপি রাজেন্দ্রনাথের কথা বলিতে বলিতে তাহাদের চোখে জল আসিতে দেখিয়াছি। তাহাদের মুখেই শুনিয়াছি যে, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কোন ছাত্র ছিল না যাহার সঙ্গে রাজেন্দ্রনাথ প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন না। রাজেন্দ্রনাথের প্রাণ ছিল তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এই প্রাণ আবার সংক্রামিত হইতে পারিত। তাহা না হইলে ভিন্নভাষাভাষী, ভিন্ন প্রদেশের লোক রাজেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া অশ্রু-বিসর্জন করিত না।

রাজেন্দ্রনাথের স্বভাবসুলভ উদাসীনতা তাঁহার সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তি-মাত্রেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিত। উদাসীনতার দুইটি বিভিন্ন রূপ আছে। একটি কর্মকুণ্ঠতার রূপান্তর মাত্র, অপরটি নিষ্কামকর্মীর বিশেষ লক্ষণ। রাজেন্দ্রনাথ নিষ্কামকর্মী ছিলেন। তাই তাঁহার উদাসীনতা ছিল নিষ্কামতার প্রতীক। বিষাদ বা চিন্তার রেখা রাজেন্দ্রনাথের মুখমণ্ডলে কেহ কোন দিন অঙ্কিত দেখিতে পায় নাই, গাম্ভীর্যের ছায়া আসিয়া সে মুখের স্বচ্ছ সহাস্য ভাবটিকে কোন দিন মুহূর্তের জন্যও কেহ ঢাকিয়া ফেলিতে দেখে নাই। মাথার উপরে যত গুরুতর কার্যের দায়িত্ব-ভারই থাকুক না কেন, তাঁহার বালসুলভ চাপল্য স্বচ্ছ হৃদয়ের অনাবিল আনন্দস্রোত এক মুহূর্তের জন্যও কেহ বন্ধ হইতে লক্ষ্য করে নাই। তাহার বন্ধুগণ বলেন যে, রাজেন্দ্রনাথ যে কোন গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ বিপ্লব-বাদের কার্যে নিযুক্ত হইতে পারে এ কথা তাহারা কল্পনাও করিতে পারে নাই। তাহার স্বভাবসুলভ চাপল্য দেখিয়া কেহই তাহাকে কোন গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিতে সাহস পাইত না। অথচ রাজেন্দ্র-নাথের দায়িত্ববোধ কত প্রখর ছিল তাহা এই দৃষ্টান্ত হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, সমস্ত যুক্তপ্রদেশীয় বিপ্লব কর্মের তত্ত্বাবধান করিবার ভার কেন্দ্রীয় সমিতি তাহারই উপর অর্পণ করিতে বিন্দুমাত্রও ইতস্তত করে নাই। তাহার দৈনন্দিন জীবনের এই উদাসীনতাই তাহাকে মৃত্যু সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ উদাসীন করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল। আদালতে যখন তাহার জীবন-মরণের সমস্যা লইয়া দিনের পর দিন আলোচনা চলিতেছিল তখন তিনি নিশ্চিন্ত মনে কাঠগড়ার ভিতর বসিয়া বন্ধুদিগকে হাসাইবার জন্য নিত্য নূতন নূতন ফন্দী বাহির করিবার কাজ লইয়াই বিভোর। তাহার এই ভাব দেখিয়া একদিন ব্যারিষ্টার মিঃ চৌধুরী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কি হে, তোমার বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ

কত প্রমাণপ্রয়োগ উপস্থিত করেছে সে সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা আছে ?" রাজেন্দ্রনাথের মুখ হইতে এমন স্বরে এমন মুখভঙ্গীর সহিত একটি ক্ষুদ্র "না" শব্দ উচ্চারিত হইল যাহাতে কেবল ব্যারিষ্টারসাহেব কেন, সহকারী কেহই বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের কথা "জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন," কেবল কবির কল্পনা মাত্র নহে, এ ছবি বাস্তব সত্যও হইতে পারে।

রাজেন্দ্রনাথ খাঁটি বিপ্লবী ছিলেন। তাই বিপ্লব বলিতে তিনি সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক বিপ্লবমাত্র মনে করিতেন না। তিনি স্বাধীনতা চাহিতেন, কিন্তু তাহার বিশেষ কোন রূপ মাত্রকে নহে। সর্বতোমুখী স্বাধীনতাই ছিল তাঁহার কাম্য। পরিবার ও সমাজে ব্যক্তিকে দাস করিয়া রাখিয়া দেশের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করিবার আন্দোলন কোনদিনই তাহার মনঃপুত হয় নাই। তাই দেশে এক বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া এক বার দেশের জন্য সর্বতোমুখী স্বাধীনতা অর্জন করিবার উদ্দেশ্য লইয়া তিনি বিপ্লবদলে যোগদান করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রনাথের বিপ্লববাদ মুখের কথা মাত্র ছিল না। কেবল theory লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবার লোক তিনি ছিলেন না। বাক্যে ও কার্যে তিনি সমভাবে বিপ্লবী ছিলেন। পুরাতন ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভগ্ন পতাকার মত যে যজ্ঞোপবীত আজও বাঁচিয়া থাকিয়া হিন্দুসমাজে অস্বাভাবিক বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছে সে যজ্ঞোপবীত ব্রাহ্মণসন্তান রাজেন্দ্রনাথ নিজে সর্বাগ্রে বর্জন করিয়া সহকারীদের সম্মুখে ধর্মবিপ্লবের সঙ্কেত নির্দেশ করিয়াছিলেন। খাদ্যাখাদ্য বিচারের মধ্যে ধর্ম লুকাইয়া নাই এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি নিজে শূকর মাংস, এমন কি গোমাংস ভক্ষণ করিতেও ইতস্তত করেন নাই। এই কার্যের প্রয়োজনীয়তা বা সার্থকতা সম্বন্ধে মতান্তর থাকিতে পারে কিন্তু এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, খাঁটি বিপ্লবী না হইলে কেহই

নিজের জীবনে এত বড় বিপ্লব সংসাধন করিতে পারে না। রাজেন্দ্রনাথ এ কথা অন্তর হইতেই বিশ্বাস করিতেন যে সমাজ ও ধর্মের সমস্ত কুসংস্কারের গোড়ায় নির্মম আঘাত না করিতে পারিলে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ভারতকে সচেতন করা সম্ভব হইবে না।

রাজেন্দ্রনাথের ভাবপ্রবণ হৃদয় শ্রমিকের প্রতি ধনিকের নির্মম ব্যবহার দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিত। তাই কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কেও তাহার অপরিসীম উৎসাহ পরিলক্ষিত হইত। সুযোগ এবং সুবিধা পাইলেই তিনি শ্রমিকদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের সুখদুঃখের কথা আলাপ-আলোচনা করিতেন; সাম্যবাদ, শ্রমিক আন্দোলন প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন, সংঘবদ্ধ হইয়া অন্যায় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার পরামর্শ দিতেন। দুস্থ ও পীড়িতের সহায়তা করিতে সর্বাগ্রে তাহাকে ছুটিয়া যাইতে দেখা যাইত। কতবার দেখা গিয়াছে যে, ডোম মেথরেও যে কাজ করিতে ঘৃণা বোধ করিয়াছে রাজেন্দ্রনাথ সহাস্যমুখে সে কাজ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। যুবকদিগকে সমস্ত প্রকার দুঃসাহসিক কর্মে প্রবৃত্ত করা অবশ্য তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের অংশবিশেষই ছিল। অনেক সময়েই যুবকদল লইয়া তিনি পায়ে হাটিয়া বা সাইকেলে চড়িয়া দূরদূরান্তরে ভ্রমণ করিতে যাইতেন। এতদ্ভিন্ন গোপনে তিনি যে পরোপকারের জন্য কত কিছু করিয়াছেন কে তাহার হিসাব জানে? রাজেন্দ্রনাথ নীরব-কর্মী ছিলেন; প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র কার্যের সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশ করিয়া নাম কিনিবার আগ্রহ তাহার ছিল না। তাহার এই আড়ম্বরহীন কর্ম-প্রচেষ্টা যতই প্রশংসনীয় হউক না কেন, আজ তাহার জীবনী লিখিতে যাইয়া আমাদের এই বলিয়া দুঃখ হইতেছে যে তাহার এই নীরবতার জন্যই জগৎ তাহার কার্যাবলী সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিবে না। তবে

ভারতের যুবকগণ যে তাহার জীবনের কর্মতালিকা হইতে মৃত্যুকাহিনীর মধ্যেই অধিকতর প্রেরণার সন্ধান পাইবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

(২)

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কাকোরী মামলার অন্যতম আসামী যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জি যুক্তপ্রদেশে বিপ্লবদলকে পুনরায় সংগঠন করিবার উদ্দেশ্য লইয়া কলিকাতা হইতে কাশীতে আসিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন সতীশচন্দ্র সিংহ। অল্প দিনের মধ্যেই শচীন্দ্রনাথ বক্সী আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগদান করেন এবং এই তিনজনে মিলিয়া যুক্তপ্রদেশের সর্বত্র বিপ্লবদলের শাখাসমিতি সংস্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। বিপ্লববাদমূলক সাহিত্যের ভিতর দিয়া ভাবপ্রবণ বালক এবং যুবকদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করাই ছিল তাহাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। রাজসাক্ষী বানোয়ারীলাল তাহার সাক্ষ্যে বলিয়াছে যে, ১৯২৩ সনের গ্রীষ্মকালে তিনি জনৈক ফেরিওয়ালাকে এলাহাবাদের পথে পথে শচীন সান্ন্যালের "বন্দীজীবন" ফেরি করিয়া বেচিতে দেখিয়া এক খণ্ড পুস্তক ক্রয় করেন। ফেরিওয়ালা তাহার নিকট পুস্তকখানি বেচিবার পর তাহার নাম ও ঠিকানা টুকিয়া লইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরেই এলাহাবাদের পুরুষোত্তম দাস পার্কে যোগেশবাবু বানোয়ারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি প্রথমেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে 'বন্দীজীবন' তাহার কেমন লাগিয়াছে। উত্তরে বানোয়ারী পুস্তকখানির প্রশংসা করিলে যোগেশবাবু তাহাকে বলিলেন যে, সে যদি অন্যান্য ছেলেদিগকে পড়িতে দিতে স্বীকৃত হয় তাহা হইলে তিনি তাহাকে ঐ রকম বই আরও অনেক পড়িতে দিতে পারেন। বানোয়ারী স্বীকৃত হইলে যোগেশবাবু তাহাকে কয়েকখানি বই পড়িতে দেন এবং ধীরে ধীরে তাহাকে গুপ্ত বিপ্লবসমিতি সম্বন্ধে

নানা কথা বলিতে থাকেন। অতি অল্প কালের মধ্যেই বানোয়ারী বিপ্লব দলের সভ্য হইতে স্বীকৃত হয় এবং ইহারই ফলে যোগেশবাবু তাহাকে প্রতাপগড়ে এক শাখাসমিতি স্থাপন করিতে পাঠাইয়া দেন। বানোয়ারী এ কার্য দক্ষতার সহিতই সম্পন্ন করিয়াছিল। যোগেশবাবু তাহার কাযে প্রীত হইয়া ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাহাকে কানপুরে ডাকিয়া পাঠান এবং এখানেই রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাহার আলাপ পরিচয় হয়। যোগেশবাবু তাহাকে বলিয়া দেন যে প্রতাপগড় রাজেন্দ্রনাথের এলাকাধীন। অতএব অতঃপর বানোয়ারী বিপ্লব-কর্ম-সম্বন্ধে রাজেন্দ্রনাথের উপদেশ মানিয়া চলিবে। ইহার পর যোগেশবাবু ঝাঁসী এবং শাহজাহানপুরে যাইয়া দুইটি শাখা-সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। শাহজাহানপুরে রামপ্রসাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয় এবং তাহার পূর্ব জীবনের ইতিহাস ও বর্তমানের মনোভাব অবগত হইয়া যোগেশবাবু তাহাকেই সমস্ত যুক্তপ্রদেশের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন। ইহার পর অক্টোবর মাসে কানপুরে গুপ্ত সমিতির এক অধিবেশন হয়। এই সভায় যুক্তপ্রদেশের সংগঠন এবং কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে মোটামুটি রকমের একটি plan স্থির হইলে যোগেশবাবু রাজেন্দ্রনাথকে আপনার প্রতিনিধিস্বরূপ যুক্তপ্রদেশে রাখিয়া স্বয়ং কলিকাতা চলিয়া যান। সেখানে ১৮ই অক্টোবর তারিখে পুলিশ তাহাকে Bengal ordinance আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করে।

যোগেশবাবু কলিকাতা ফিরিয়া গিয়াই যখন ধরা পড়িলেন তখন রাজেন্দ্রনাথকে কতকটা বাধ্য হইয়াই সমস্ত কার্যভার গ্রহণ করিতে হইল। ইতিপূর্বে তাহাকে কেবলমাত্র কাশী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছিল, যোগেশবাবু ফিরিয়া যাইবার সময় তাহাকে অন্যান্য বিভাগের দিকেও একটু দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাহার অন্তরীণ হওয়ায় রাজেন্দ্রনাথের কার্যের দায়িত্ব ও গুরুত্ব

অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গেল। নিজ বিভাগের কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার পর তাহাকে অন্যান্য বিভাগের কার্য তত্ত্বাবধান করিতে হইত। বানোয়ারী ছিল তাহার প্রধান সহকারী, অথচ এই বানোয়ারীই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ধরা পড়িবার অব্যবহিত পরেই সমস্ত সংবাদ প্রকাশ করিয়া দেয়। বানোয়ারী প্রায়ই রাজেন্দ্রনাথের নিকট হইতে অর্থসাহায্য পাইত এবং রাজেন্দ্রনাথের আদেশেই সে প্রতাপগড় হইতে রায়বেরিলীতে বদলী হইয়া ছিল। বানোয়ারী রাজেন্দ্রনাথের নিকট হইতে কেবল অর্থসাহায্যই পাইত না, রাজেন্দ্রনাথ তাহাকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়াও সাহায্য করিতেন। রাজেন্দ্রনাথের 'চারু', 'জহরলাল', 'যুগলকিশোর' প্রভৃতি অনেক ছদ্মনাম ছিল। বিপ্লবদলের বিভিন্ন সভ্যের নিকট চিঠিপত্র লিখিতে তিনি বিভিন্ন ছদ্মনাম ব্যবহার করিতেন। চিঠিপত্র পুলিশের হাতে পড়িলে তাহারা যাহাতে সহজে লেখকের সন্ধান না পাইতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই মিথ্যা নাম ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বানোয়ারীর বিশ্বাসঘাতকতায় এ সকল কথাই পুলিশ জানিতে পারিয়াছিল আর সেই জন্যই আজ আমরা এ সব সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম।

যাহা হউক, ট্রেণ ডাকাতি রামপ্রসাদের নেতৃত্বে সংগঠিত হইলেও এ সম্বন্ধে সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজন রাজেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানেই সম্পন্ন হইয়াছিল। আদালতে প্রমাণ হইয়াছে যে, রাজেন্দ্রনাথ স্বয়ং ট্রেণ ডাকাতিতে যোগদান করিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী হইতে তিনিই প্রথমে শিকল টানিয়া গাড়ী থামাইয়াছিলেন। রাজেন্দ্রনাথ স্বভাবতই দেখিতে সুন্দর ছিলেন। ডাকাতির দিন হাফ-প্যাণ্ট, সার্ট ও পাগড়ী পড়িয়া তাহাকে বোধহয় আরও বেশী সুন্দর দেখাইতেছিল। তাহার চেহারার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য না থাকিলে ঐ গাড়ীর এক জন

আরোহী সাক্ষী হইয়া আসিয়া এত লোকের মধ্যে তাহাকেই ঠিক করিয়া নির্দেশ করিতে পারিত না।

এই ট্রেণডাকাতির অব্যবহিত পরেই দক্ষিণেশ্বরের বাড়ীতে এক বোমার কারখানা স্থাপিত হয়। এই সুযোগে যুক্তপ্রদেশ হইতে কেহ যাইয়া বোমা প্রস্তুত করিতে শিখিয়া আসুক ইহা রাজেন্দ্রনাথের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। তিনি রামপ্রসাদকেই এই কার্যের জন্য কলিকাতা পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন, রামপ্রসাদ স্বীকৃতও হইয়াছিলেন। পুলিশের কৃপায় জনসাধারণ এই সম্বন্ধে চিঠিপত্রের কিছু কিছু অংশ পড়িবার সুবিধা পাইয়াছে। আমরাও বাঙলা করিয়া তাহার কতক অংশ পাঠকদিগকে উপহার দিতে চেষ্টা করিব। ১৭ই সেপ্টেম্বর রাজেন্দ্রনাথ মথুরাপ্রসাদের ছদ্মনামে কাশী হইতে রামপ্রসাদকে লিখিয়াছিলেন, "যে অনাথ বালকটিকে ছুতুরের কাজ শিখিবার জন্য পাঠাইব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, বাড়ীর কাজের ঝঞ্ঝাটে সে আর দোকানে যাইতে পারিবে না। সুতরাং আমাদের দুই জনের মধ্যে এক জনকেই যাইতে হইবে। দোকানের স্বত্বাধিকারী কালীবাবু এখন পর্যন্ত কোন পত্র লিখেন নাই। তাহার পত্র পাইলেই আমাদের মধ্যে এক জনকে যাইতে হইবে। সুতরাং আপনি যাইতে পারিবেন কিনা স্থির করিয়া শীঘ্র আমাকে জানাইবেন। আপনার যদি সময় না থাকে তাহা হইলে আমিই যাইব। কেননা, পূজার ছুটিতে আমার বেশ সময় আছে।" ২২শে সেপ্টেম্বর 'মথুরা' এই নামে তিনি পুনরায় লিখিয়াছিলেন, "আপনার পত্র আজ পাইলাম। কালীবাবুর পত্রও এই মাত্র আসিয়াছে। তিনি ২৬শে সকালে তাহার সহিত দেখা করিতে বলিয়াছেন। আমার মনে হয় আপনি ২৪শে আমার পত্র পাইবেন। সেই দিনই যদি ডাক গাড়ীতে আপনি রওয়ানা হন তাহা হইলে সেই দিনই এখানে আসিয়া পৌছিতে

পারিবেন। তারপর ঠিকানা ইত্যাদি লইয়া ২৫শে সকালে এখান হইতে রওয়ানা হইলেই আপনি নিয়মিত সময়ে গন্তব্যস্থানে পঁহুছিতে পারিবেন! কাজ বড়ই জরুরী; সুতরাং ২৪শে রাত্রির মধ্যে আপনি যদি এখানে আসিয়া পৌছিতে না পারেন তাহাহইলে ২৫শে প্রাতঃকালে আমি নিজেই রওনা হইয়া যাইব……।" রামপ্রসাদের সমস্ত চিঠিপত্র ইন্দুর নামে স্কুলে আসিত। কিন্তু তখন পূজার ছুটি উপলক্ষে স্কুল বন্ধ ছিল বলিয়া যথা-সময়ে দ্বিতীয় পত্র রামপ্রসাদের হস্তগত হয় নাই; সুতরাং ২৫শে রাত্রিকালে তাহার কাশী উপস্থিত হওয়াও সম্ভব হয় নাই। অতএব রাজেন্দ্রনাথকেই কলিকাতা রওনা হইয়া যাইতে হইয়াছিল। তাই ২৮শে সেপ্টেম্বর যখন একই সময়ে রাজেন্দ্রনাথ ও রামপ্রসাদের গৃহে খানাতল্লাশী হইতেছিল তখন রাজেন্দ্রনাথ কলিকাতা পঁহুছিয়া গিয়াছেন। রামপ্রসাদকে সেই দিনই গ্রেপ্তার করা হইল কিন্তু রাজেন্দ্রনাথের সন্ধান মিলিল না। তারপর কেমন করিয়া রাজেন্দ্রনাথ ধরা পড়িলেন তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

(৩)

বিচারে রাজেন্দ্রনাথের প্রতি ফাঁসীর হুকুম হইল। চীফ কোর্টের আপীল, প্রীভি কাউন্সিলের আপীল, দয়া প্রার্থনা প্রভৃতি একে একে সবই ব্যর্থ হইয়া গেল। আইন অন্ধ, আইনের হৃদয়ে দয়া মায়া নাই। যত বড় মহৎ উদ্দেশ্য লইয়াই হউক না কেন, আইন ভঙ্গ করিলে প্রত্যেক মানুষকেই শাস্তি পাইতে হইবে। নিষ্কাম-কর্মী রাজেন্দ্রনাথের বীর-হৃদয় মৃত্যুভয়ে কাঁপিল না, গোণ্ডা জেলে তিনি গীতা ও উপনিষদ পাঠ করিয়া আসন্নমৃত্যুর প্রতীক্ষায় কাল কাটাইতে লাগিলেন। তাহার এই সময়ের মনোভাব সম্বন্ধে আমরা নিজের ভাষায় কোন কিছু বর্ণনা করিতে চেষ্টা না করিয়া রাজেন্দ্রনাথের স্বলিখিত দুই খানি পত্র উদ্ধৃত করিব। পাঠক

দেখিবেন যে সকল বিপ্লবীর হৃদয়ই একই ছাঁচে ঢালা। সংঘের বেদীমূলে আত্মবিসর্জন করিলে সকলেই সমভাবে মৃত্যুকে উপেক্ষা করিতে পারে।

১১ই অক্টোবর তারিখ ফাঁসীর দিন নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহার প্রায় সপ্তাহ খানিক পূর্বে রাজেন্দ্রনাথ তাহার এক আত্মীয়ের নিকট নিম্নলিখিতরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন, "…সুদীর্ঘ ছয় মাস কাল বরাবঙ্কি ও গোণ্ডা জেলে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিবার পর কাল খবর পাইয়াছি যে এক সপ্তাহের মধ্যেই ফাঁসী হইয়া যাইবে। আমাদের সকলের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য আমাদের যে সমস্ত পরিচিত ও অপরিচিত বন্ধু অর্থদান করিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাদের প্রতি আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনারা সকলে আমার শেষ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। মৃত্যু দেহের পরিবর্তন মাত্র। জীর্ণ বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করিবার মতই আত্মা পুরাতন দেহ পরিবর্তন করিয়া নূতন দেহ আশ্রয় করে। মৃত্যু আগতপ্রায়, আমি প্রশান্ত চিত্তে ও হাসিমুখেই তাহাকে আলিঙ্গন করিব। জেলের কড়াকড়ি নিয়ম, তাই বেশী-কিছু লিখিবার উপায় নাই। আপনি আমার নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ভারতে দেশপ্রেমিক যাহারা আছেন তাঁহাদিগকে আমি আমার আন্তরিক নমস্কার জ্ঞাপন করিতেছি। 'বন্দেমাতরম্'।

আপনার—রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।

এই পত্র লিখিবার অব্যবহিত পরেই প্রীভি কাউন্সিলে আপীল রুজু হয়। সুতরাং ১১ই তারিখ আর ফাঁসী হইতে পারে না। প্রীভি-কাউন্সিলের আপীল ডিসমিস হইবার পর ফাঁসীর জন্য শেষবার দিন ধার্য হইলে রাজেন্দ্রনাথ গোণ্ডা জেল হইতে ১৭ই ডিসেম্বর একজন বন্ধুর নিকট নিম্নলিখিতরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন, "প্রীভি কাউন্সিলের আপীল ডিসমিস

হইযাছে এ সংবাদ কাল পাইয়াছি। আমাদের প্রাণবক্ষা কবিবার জন্য আপনাবা যথেষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু সকল চেষ্টা নিস্ফল হইতে দেখিয়া আজ স্বতঃই মনে হইতেছে যে, হযত বা দেশের জন্য আমাদের প্রাণ বলিদান কবিবার প্রযোজন আছে। মৃত্যু কি? জীবনেব রূপান্তর মাত্র। জীবন কি? মৃত্যুব অপব রূপ ভিন্ন কিছুই নহে। সুতবাং মানুষ মৃত্যুভযে ভীতই বা হইবে কেন, কেহ মবিলে দুঃখিতই বা হইবে কেন? প্রাতঃকালে সূর্যোদয হওযা যেমন স্বাভাবিক, মৃত্যুও তেমনই এক স্বাভাবিক ঘটনা মাত্র। History repeats itself—এ কথা যদি সত্য হয তাহা হইলে আমাব দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে আমাদেব মৃত্যু ব্যর্থ হইবে না। সকলকে আমাব অন্তিম নমস্কাব জানাইবেন।"

আপনার—বাজেন্দ্র

ফাঁসীব পূর্ব বাত্রিতে রাজেন্দ্রনাথ অনেক বাত্রি পর্যন্ত জাগিযা গীতা ও উপনিষদ পাঠ কবিয়াছিলেন। বাত্রি প্রভাত হইবাব পূর্বেই জল্লাদ আসিযা যখন তাহাব গৃহেব দ্বার খুলিযা দিল তখন তিনি হাসিতে হাসিতেই বাহির হইযা আসিলেন। ফাঁসিকাষ্ঠেব সম্মুখে আসিয়াও সে হাসিমুখেব বিন্দুমাত্রও রূপান্তব হইল না। সব শেষ হইয়া গেলে তাঁহাব মৃতদেহটিকে মঞ্চ হইতে যখন নীচে নামাইযা লওযা হইল তখনও দেখা গেল যে তাঁহাব ওষ্ঠাধবেব পার্শ্বে হাসিটুকু যেন লাগিযাই বহিযাছে। হাযবে পবাধীন দেশ! এ দেশে এমন অমূল্য প্রাণ লইযাও ছিনি-মিনি খেলা চলিতে পারে।

বাহিরে রাজেন্দ্রনাথের সহোদর ভ্রাতা অপেক্ষা করিতেছিলেন। যথাসময়ে মৃতদেহটিকে বাহিরে লইয়া যাইবাব আদেশ আসিলে উহা বাহিরে লইয়া যাওয়া হইল। বাংলার কৃতী সন্তানকে সম্মান প্রদর্শন করিবার সুযোগ বাঙালী পাইল না। কিন্তু গোণ্ডার ইতরভদ্র অনেকেই

রাজেন্দ্রনাথের মৃত আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য শ্মশানঘাটে সমবেত হইয়াছিলেন।

বাঙলা রাজেন্দ্রনাথের দেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার সুযোগ পায় নাই বটে কিন্তু বাঙালী যুবক কি তাঁহার আদর্শকে গ্রহণ করিয়া রলোকগত আত্মার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে অগ্রসর হইবে

উপসংহার

অনেক দিন হইতেই ভারতে একটি বিপ্লব প্রচেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। ভারতসরকারও তাহাদের সমস্ত শক্তি দিয়া এ আন্দোলনের গলা টিপিয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু idea বা ভাবের শরীর নাই। আত্মার মতই ইহা অবিনশ্বর। ফাঁসীকাষ্ঠে ইহার মৃত্যু হয় না, অগ্নিতে ইহাকে দগ্ধ করা যায় না, দমননীতি কেবল ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার সহায়তা করে মাত্র। বিপ্লববাদ এইরূপ একটি ভাব ভিন্ন অপর কিছু নহে বলিয়াই প্রচণ্ড দমননীতিকে উপেক্ষা করিয়া আজও ইহা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

ভারতবাসীর প্রাণে স্বাধীনতার একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আকাঙ্ক্ষা যে নিতান্তই ন্যায্য তাহা রাজ-রাজেশ্বর সম্রাট বাহাদুর হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় অনেক রাজকর্মচারীই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। অথচ এই ন্যায্য আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করিবার জন্য ইংরাজ রাজনীতিকদের কাহারও কোন আগ্রহ লক্ষিত হইতেছে না। বৃটিশ মন্ত্রীসভার এই ঔদাসীন্যই যে পরোক্ষভাবে ভারতের বিপ্লব আন্দোলকে প্রশ্রয় প্রদান করিতেছে সে সম্বন্ধে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারত সরকারের দমননীতি অবশ্য ইহার অপর আর একটি মুখ্য কারণ। প্রকাশ্য এবং বৈধ আন্দোলনকে ছলে বলে কৌশলে গলা টিপিয়া মারিবার জন্য সরকারের আগ্রহের অবধি নাই। স্কুল-কলেজের ছাত্রদিগকে রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে জোর করিয়া দূরে রাখাই সরকারী শিক্ষা-বিভাগের নীতি। ইহার ফলে ভারতের যুবকগণ প্রকাশ্যভাবে দেশ-সেবা করিবার কোনই সুযোগ পায় না। অথচ দেশসেবার আকাঙ্ক্ষা

অল্পাধিক পরিমাণে সকল শিক্ষিত ভদ্রসন্তানের হৃদয়েই জাগ্রত রহিয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ্যভাবে আত্ম-প্রকাশ করিবার সুযোগ পায় না বলিয়াই অনেক সময়ে গুপ্তভাবে সার্থকতা খুঁজিয়া বেড়ায়। সরকার যদি সত্য সত্যই এই আন্দোলনের অঙ্কুর বিনষ্ট করিতে চান তাহা হইলে ভারতবাসীর ন্যায্য দাবী তাহাদিগকে অচিরেই স্বীকার করিতে হইবে।

গুপ্তভাবে বিপ্লবান্দোলন করিতে গিয়া ভারতের অনেক কৃতী সন্তানই অকালে আপনাদের অমূল্য জীবন বিসর্জন দিয়াছেন। একদিকে সরকার যেমন এই সমস্ত অমূল্য প্রাণের মূল্য স্বীকার করেন নাই, অপর দিকে দেশনায়কগণও যে তাহার যোগ্য পুরস্কার দিয়াছেন তাহা নহে। ভাবপ্রবণ যুবকহৃদয়কে দাবাইয়া রাখাই নেতৃবৃন্দের চিরাচরিত রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সমস্ত ভাবপ্রবণ যুবকদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া সেই সংহত শক্তিকে দেশ-সেবায় নিয়োজিত করিবার তেমন কোন চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সুখের বিষয় আজকাল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যুবক-আন্দোলনকে উৎসাহিত করিয়া আপনাদের পূর্বকৃত ভুল কর্তকটা শোধরাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন।

আর এই যে অমূল্য জীবনগুলি এমন করিয়া ফাঁসীকাষ্ঠে নষ্ট হইয়াছে এবং হইতেছে তাহার জন্য দেশবাসীর দায়িত্বই কি কম? প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ডাকাতি করিতে যাইয়া ইহারা ধরা পড়িয়াছেন। ভারতবর্ষ দরিদ্র বটে, কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য অর্থ সরবরাহ করিতে পারে না এত দরিদ্র নয়। অথচ এমনই ভারতবাসীর ঔদাসীন্য যে দেশকর্মী বার বার হাঁটাহাঁটি করিয়াও ইহাদের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে না। দেশ-সেবক বিপ্লবী হইতে পারে, কিন্তু স্বার্থপর নয়। নিজের পেট পুরিবার উদ্দেশ্য লইয়া তাহারা দ্বারে দ্বারে অর্থ ভিক্ষা করিতে বাহির হয় না। অথচ সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থ বেশীর

ভাগ সময়েই ইহাদিগকে ভিখারীরও অধিক ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে দেশবাসী যদি সাধ্যমত 'মুক্তহস্ত' হইয়া দেশকর্মীর আর্থিক অভাব দূর করিতে প্রয়াস পান তাহা হইলে আর ইহাদিগকে ডাকাতি করিতে হয় না। রামপ্রসাদের মত প্রত্যেক বিপ্লবীই ডাকাতিকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে। তাহাদের উদ্দেশ্য দেশব্যাপী এক বিপ্লব সৃষ্টি করা, ডাকাতি করা নহে। অথচ কেবলমাত্র 'হা অর্থ' 'হা অর্থ' করিয়াই ইহাদের সমস্ত জীবন কাটিয়া যায় এবং অবশেষে অর্থ সংগ্রহ করিতে যাইয়াই ইহাদের অকালে জীবনাবসান হয়, ইহা কি দেশবাসীর পক্ষে কম লজ্জার কথা?

ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা সশস্ত্র বিপ্লবান্দোলনের অনুকূল নহে তবে কোনদিন যে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়োজন হইবে না এমন কথাও কেহ জোর করিয়া বলিতে পারিবে না। দেশের বিছিন্ন শক্তিকে সংহত করাই বর্তমানে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কাজ। যে সমস্ত যুবক জীবনকে সত্য সত্যই তুচ্ছ করিতে পারেন তাহারা এক ব্যর্থ প্রয়াসে জীবন নষ্ট না করিয়া প্রকৃত কাজে আত্মনিয়োগ করিলেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করা হইবে।

সমাপ্ত